বাংলা সাহিত্য চয়নিকা

উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের পাঠ্যপুস্তক

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম পরিকাঠামো 2005-এর (NCF-2005) আধারে

BANGLA SAHITYA CHAYANIKA : *A textbook of Bengali MIL for Class H.S. 1st year (New Syllabus) prepared according to National Curriculum Framework (NCF) 2005, edited by the Editorial Board (Bengali) AHSEC and published by the Assam State Textbook Production and Publication Corporation Ltd., Guwahati on behalf of Govt. of Assam.* **FREE TEXTBOOK**

© অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, ২০১৮

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

❖ প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার যে কোন অংশের ছাপানো কার্য, অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, যান্ত্রিক মাধ্যম, ফটো প্রতিলিপি, রেকর্ডিং কিংবা অন্য কোন উপায়ে পুনঃপদ্ধতির সাহায্যে এর সংগ্রহ করা বা সংবর্ধন করা নিষিদ্ধ।

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১০
সপ্তম প্রকাশ ঃ ২০১৮ (পরিবর্দ্ধিত নতুন সংস্করণ)

মুদ্রণ ঃ 70 জি এস এম

প্রচ্ছদ ঃ 165 জি এস এম

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ সঞ্জীব বরা

প্রকাশক ঃ অসম সরকার দ্বারা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দ্য আসাম স্টেট টেক্সটবুক প্রোডাকশন অ্যান্ড পাবলিকেশন করপোরেশন লিমিটিড-এর দ্বারা প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক।

প্রণয়ন ঃ অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি।

মুদ্রক ঃ

ভূমিকা

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য তথ্য-সম্বলিত পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কর্তব্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকলদিকে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার যে কোনো স্তরে পাঠক্রমের সংশোধন এক অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া। বিশ্বায়নের যুগে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সর্বভারতীয় বা সমগ্র বিশ্বের পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে এবং একই ধরনের জ্ঞান আহরণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা সংসদ ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠক্রমের সংশোধন করেছে। এই সংশোধন রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ দ্বারা তৈরি রাষ্ট্রীয় পাঠক্রম পরিকাঠামো ২০০৫ (National Curriculum Framework-2005)-এর অনুসরণে করা হয়েছে।

'বাংলা সাহিত্য চয়নিকা' (প্রথম বর্ষ) বইটি বহুসংখ্যক ব্যক্তির এক সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। এই বইতে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিসীমা বাড়ানোর জন্য সাহিত্যের (পদ্য, গদ্য, নাটক) সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণেরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হল। পদ্য ও গদ্য পাঠের কোথাও বানান-সংস্কার করা হয় নি।

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে সম্পাদনা-সমিতির সকল সদস্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুথি প্রস্তুতি-সমিতির প্রতিজন ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই বিষয়ে বিজ্ঞজনের কাছ থেকে গঠনমূলক পরামর্শ সাগ্রহে কামনা করি, যাতে পরবর্তী সংস্করণসমূহ আরো উন্নতভাবে প্রকাশ করা যায়।

বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি

সচিব
অসম উচ্চতর মাধ্যমিক
শিক্ষা সংসদ

সম্পাদনা-সমিতি

প্রধান সম্পাদক
ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি

অধ্যাপক মিতা চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
বাংলা বিভাগ
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি

অধ্যাপক শান্তনু রায়চৌধুরী
বাংলা বিভাগ
পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি

অধ্যাপক অভিজিৎ চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ
টংলা মহাবিদ্যালয়, টংলা

সর্বাণী ভৌমিক
বিষয় শিক্ষয়িত্রী (বাংলা)
নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
গুয়াহাটি।

SYLLABUS FOR HIGHER SECONDARY
FIRST YEAR COURSE
BENGALI
(MIL)

One Paper Time : Three hours Marks : 100

Unitwise distribution of Marks and Periods :

Unit	Topics		Marks	Periods
Unit I	Poetry	:	30	35
Unit II	Prose	:	40	75
Unit III	Drama	:	15	15
Unit IV	Grammar	:	15	15
	Total		100	140

পাঠ্যপুস্তক ঃ বাংলা সাহিত্য চয়নিকা (উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথমবার্ষিক)

Unitwise Distribution of Marks & Periods :

Unit I : নির্বাচিত পদ্য / Marks 30 / Periods 35

১। বৈষ্ণবী মায়া ঃ বৃন্দাবন দাস
২। কালকেতুর ভোজন ঃ মুকুন্দ চক্রবর্তী
৩। বর্ষায় লোকের অবস্থা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৪। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ঃ জীবনানন্দ দাশ
৫। বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায় ঃ জসীমুদ্দিন
৬। মায়াতরু ঃ অশোকবিজয় রাহা
৭। ফুল ফুটুক না ফুটুক ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৮। কেউ কথা রাখেনি ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Unit II : নির্বাচিত গদ্য / Marks 40 / Periods 75

১। লজ্জাবতী ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী
২। ইচ্ছাপূরণ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। আহার ও পানীয় ঃ স্বামী বিবেকানন্দ
৪। মহেশ ঃ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫। তাসের ঘর ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। প্রাচীন কামরূপের শাসন নীতি ঃ রাজমোহন নাথ
৭। আদাব ঃ সমরেশ বসু
৮। সৃষ্টির আদিকথা ও জুমচাষ প্রচলনের কাহিনি ঃ নিরঞ্জন চাক্মা

Unit III : নাটক / Marks 15 / Periods 15

ভাড়াটে চাই ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

Unit IV : ব্যাকরণ / Marks 15 / Periods 15

পদ-পরিবর্তন, প্রত্যয়, শব্দভাণ্ডার, অশুদ্ধি সংশোধন, কারক-বিভক্তি

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজবাদী ধর্মনিরপেক্ষ লোকতান্ত্রিক গণরাজ্যরূপে গঠন করবার জন্য, তথা দেশের সকল নাগরিকের জন্য—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়, চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা লাভ করতে এবং সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা তথা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকারী ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করতে নিষ্ঠাভরে শপথ করি—আমাদের গণ পরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ করে বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

সূচিপত্র

পদ্যাংশ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বৈষ্ণবী মায়া	বৃন্দাবনদাস	১
কালকেতুর ভোজন	মুকুন্দ চক্রবর্তী	৬
বর্ষায় লোকের অবস্থা	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১১
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	জীবনানন্দ দাশ	১৬
বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়	জসীমুদ্দিন	২০
মায়াতরু	অশোকবিজয় রাহা	২৪
ফুল ফুটুক না ফুটুক	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	২৯
কেউ কথা রাখেনি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪

গদ্যাংশ

ইচ্ছাপূরণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০
লজ্জাবতী	স্বর্ণকুমারী দেবী	৫০
মহেশ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৭
আহার ও পানীয় (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)	স্বামী বিবেকানন্দ	৮৪
প্রাচীন কামরূপের শাসন নীতি	রাজমোহন নাথ	১০০
সৃষ্টির আদিকথা ও জুমচাষ প্রচলনের কাহিনি	নিরঞ্জন চাকমা	১১২
তাসের ঘর	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৩
আদাব	সমরেশ বসু	১৩৯

নাটক

ভাড়াটে চাই	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫১

ব্যাকরণ

পদ-পরিবর্তন, প্রত্যয়, শব্দভাণ্ডার, অশুদ্ধি সংশোধন, কারক-বিভক্তি ১৮৩

বৈষ্ণবী মায়া

বৃন্দাবনদাস

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

মধ্যযুগে বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। মহাপুরুষ চৈতন্যদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নাম সংকীর্তন ধর্ম প্রচার করে কলিযুগের মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে। অবতাররূপী শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জীবনকে নিয়েই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্য তথা দর্শন পুষ্ট হয়েছিল।

বাংলাভাষায় বৃন্দাবনদাসই প্রথম ব্যক্তি (জীবনীকার) যিনি 'চৈতন্য-ভাগবত' নামে চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। নির্বাচিত 'বৈষ্ণবী মায়া', 'চৈতন্য-ভাগবত'-এরই একটি অংশ। এই কবিতাটির (পদটির) মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের 'চৈতন্য-ভাগবত' তথা বৃন্দাবনদাসের ভক্তপ্রাণের আন্তরিক ভক্তি, উচ্ছ্বসিত অনুরাগ, কৌতুকপ্রবণতা ও কাব্য ভাষার পরিচয় দেওয়া হল।

লেখক-পরিচিতি :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক বিরল সম্মানের অধিকারী হয়ে আছেন বৃন্দাবনদাস। তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনী-সাহিত্যের রচয়িতা। চৈতন্যদেবের পূত জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত 'চৈতন্যভাগবত' হল সেই জীবনীকাব্য। শুধু বৈষ্ণবদের মধ্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছেও বইটির সমান সমাদর।

বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আনুমানিক ১৫০৫ থেকে ১৫১৮ অব্দের মধ্যে যেকোনো সময়ে বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের কোথাও কবি পিতৃপরিচয় না দিলেও তাঁর মায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর মা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীদেবী। বৃন্দাবনদাসের

পিতৃ পরিচয় নিয়ে সংশয় আছে। নবদ্বীপের অদূরে অবস্থিত মামগাছি গ্রামে বৃন্দাবনদাসের শৈশব অতিবাহিত হয়। মা নারায়ণীদেবী তাঁকে নিয়ে বাসুদেব দত্তের ঘরে আশ্রিতা হয়েছিলেন। এই গ্রামেরই কাছাকাছি বড়গাছি গ্রামে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ মাঝে মাঝে আসতেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় এবং তিনি একসময় শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নিজের লেখায় বৃন্দাবনদাস অনেকবারই জানিয়েছেন যে তিনি নিত্যানন্দের সর্বশেষ শিষ্য। চৈতন্যদেবের জীবৎকালে বৃন্দাবন খুব ছোটো ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি। গুরু নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি চৈতন্যজীবনী লিখতে শুরু করেন। সমগ্র বৈষ্ণবসমাজে তিনি ‘চৈতন্যলীলার ব্যাস’ নামে সমাদৃত হয়েছিলেন। এই সম্মানটি তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

আনুমানিক ২২-২৩ বছর বয়সে বৃন্দাবনদাস ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন। সমালোচকদের অনুমান, আনুমানিক ১৫৩৫-৩৬ অব্দে তিনি গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। গ্রন্থটিতে মোট তিনটি খণ্ড আছে। আদি খণ্ডে ১৫টি অধ্যায়, মধ্যখণ্ডে ২৬টি এবং অন্ত্যখণ্ডে ১০টি অধ্যায় আছে। চৈতন্যদেবের শেষ জীবন সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস বিশেষ অবহিত ছিলেন না। তাই আকস্মিকভাবেই গ্রন্থের খণ্ডটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বর্তমান কবিতাটি এই গ্রন্থের আদিখণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে।

আনুমানিক ১৫৮৯ অব্দে বৃন্দাবনদাস পরলোকগমন করেন।

মূলপাঠ :

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখে দিব্য অলঙ্কার।
দুই চোরে হরিবারে চিন্তে পরকার।।
বাপ বাপ বলি এক চোরে কৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলা আর চোর বলে।।
ঝাট ঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে।
হাসি কহে প্রভু চল চল যাই ঘরে।।

অস্তেব্যস্তে দুই চোর কোলে করি ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লঞা যায়।।
অর্বুদ অর্বুদ লোক কে কাহারে চিনে।
মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে।।
কেহ ভাবে মনে মুঞি নিমু তাড়-বালা।
এইমত দুই চোর খায় মনকলা।।
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম্মস্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যায় নারায়ণে।।
এক চোর প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর চোর বলে এই আইলাম ঘরে।।
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূর যায়।
এথা যত জন সব চাহিয়া বেড়ায়।।
কেহ বলে আইস আইস বাপ বিশ্বম্ভর।
কেহ ডাকে নিমাঞি করিয়া উচ্চৈঃস্বর।।
পরম আকুল হইলেন সর্ব জন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন।।
সবে সর্ব্বভাবে গেলা কৃষ্ণের শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন।।
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথের ঘরে আইল নিজঘর জ্ঞানে।।
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্ম্মস্থানে।
অলংকার হরিতে হইলা সাবধানে।।
চোর বলে নামো বাপ আইলাম ঘর।
প্রভু বোলে হয় হয় নামাও সত্ত্বর।।
যেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে শিরে দিয়া হাত।।
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে।।

নাম্বিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বোলে।।

শব্দার্থ ও টীকা :

আথেবাথে— ব্যগ্রভাবে, আগ্রহে, অস্থিরভাবে। অর্বুদ অর্বুদ— দশ কোটি, এখানে অসংখ্য, অগণন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাড়-বালা— বাহুর অলংকার। ভাণ্ডিয়া— ঠকিয়ে, প্রতারণা করে। মর্ম্ম-স্থানে— ঘাঁটিতে। আপ্তগণ— ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। স্কন্ধের— কাঁধের। মৎস্যের— মাছের। ভবন— বাসগৃহ। হরিতে— হরণ করতে বা চুরি করতে। সত্বর— শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। নাম্বিলেই— নামলেই।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?

(খ) ‘বৈষ্ণবী মায়া’ কবিতাটিতে কাব্যাংশটিতে কার বাল্যলীলা বর্ণনা করা হয়েছে?

(গ) বৃন্দাবন দাসের মায়ের নাম কী?

(ঘ) “প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখে দিব্য অলঙ্কার”—এখানে প্রভু বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(ঙ) মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বাল্যনাম কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) চৈতন্যদেবের মাতা-পিতার নাম উল্লেখ করো।

(খ) দুই চোর শিশু নিমাইকে কেন হরণ করেছিল? তাদের অভিপ্রায় কি পূর্ণ হয়েছিল?

(গ) নিমাইকে হরণ করবার পর নবদ্বীপবাসীর মনের অবস্থা কী হয়েছিল?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো ঃ

"জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন।"

(খ) কাব্যাংশটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

পাঠবোধ :

বৃন্দাবনদাস বিরচিত 'চৈতন্য-ভাগবতে'র আদি খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের এই পদটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদগাতা, প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

একদিন স্বর্ণালংকারের লোভে দু-জন চোর শিশু নিমাইকে কোলে নিয়ে পালায়। কিন্তু ভগবানের মায়ায় ভুলে নানা স্থানে ঘুরে শেষে তারা নিমাইয়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে এসেই হাজির হয়। নিমাইও চোরের কোল থেকে নেমে হাসতে হাসতে বাবার কোলে গিয়ে ওঠেন।

এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের অবতার রূপটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

কালকেতুর ভোজন

মুকুন্দ চক্রবর্তী

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

'কালকেতুর ভোজন' পাঠটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা চণ্ডীমঙ্গল/কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠের মধ্য দিয়ে কবি মধ্যযুগীয় (তৎকালীন) বাঙালির দৈনন্দিন সমাজজীবন এবং সেই জীবনের সঙ্গে জড়িত রসরসিকতাকে (কৌতুকরসকে) উজ্জীবিত করে তুলেছেন।

অতি অল্পাক্ষরে কবি কালকেতু ও ফুল্লরার জীবনের যে খণ্ডচিত্র এঁকেছেন, তাতে লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীলতা, আন্তরিকতা, ব্যাপক-অভিজ্ঞতা ও বস্তু-স্বরূপের প্রতিফলন নৈপুণ্য প্রভৃতি ঔপন্যাসিক গুণাবলি ফুটে উঠেছে। এসব গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবিতাটি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

লেখক-পরিচিতি :

যে ক'জন প্রাচীন কবি আধুনিক বাঙালি সমাজে কিছুটা প্রচার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে যে আত্মপরিচয় অংশটি সংযোজিত হয়েছে, সেখান থেকেই কবি মুকুন্দের সম্পর্কে সবিশেষ জানা যায়। তাঁরা কয়েকপুরুষ ধরে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর তীরে দামুন্যা (মতান্তরে দামিন্যা) গ্রামে চাষবাস করে থাকতেন। তাঁর পিতামহ হলেন পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ মিশ্র আর পিতা হৃদয় মিশ্র। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে দামুন্যায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। তালুকদার গোপীনাথ মজুমদারের তালুক বাজেয়াপ্ত হলে কবি মুকুন্দ গ্রাম ছেড়ে মেদিনীপুর অঞ্চলের দিকে পালিয়ে যান। পথে নানা কষ্ট সহ্য করে তিনি জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হন। শ্লোক রচনা করে রাজপ্রশস্তি গেয়ে তিনি বাঁকুড়া রায়ের কৃপাদৃষ্টি অর্জন

করেন। কবির বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বাঁকুড়া রায় তাঁকে শিশুপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি করেন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হন। রঘুনাথের রাজ্যলাভের পর মুকুন্দ দীর্ঘদিনের চেষ্টায় দেবী চণ্ডীর গান 'অভয়ামঙ্গল' বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন। অবশ্য এর অনেক আগেই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটানোর সময় তিনি মঙ্গলগান রচনার জন্য দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন।

১৮২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দে রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। সেখানে মুকুন্দের আবির্ভাব ও গ্রন্থ রচনার কালজ্ঞাপক কয়েকটি ছত্র ছিল। বিশেষজ্ঞরা সেই ছত্রটির বিশ্লেষণ করে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আনুমানিক ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুকুন্দ চক্রবর্তী ডিহিদারের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দামুন্যা গ্রাম ছেড়েছিলেন। আর রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে আনুমানিক ১৫৯০-৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাব্যটি রচনা করেন।

কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত— দেবখণ্ড, আখেটিক (বা ব্যাধ) খণ্ড, এবং বণিকখণ্ড। প্রথম খণ্ডের বিষয় দক্ষকন্যা সতী ও হিমালয়দুহিতা উমার পরিচিত পৌরাণিক কাহিনি। আখেটিক খণ্ডে কালকেতু ও ফুল্লরার উপ্যাখ্যানের মাধ্যমে মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার-কাহিনি। আর বণিকখণ্ডে আছে ধনপতি-খুল্লনার কাহিনি। বর্তমান কবিতাটি গ্রন্থের আখেটিক বা ব্যাধখণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে।

এই কবির তিরোধান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

মূলপাঠ :

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।।
বোঁচা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।
করিল ফুল্লরা তবে ভোজনের স্থল।।
চরণ পাখালি বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে।।

সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
বেঞ্জন খাইতে দিল নূতন খাপরা।।
মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।।
চারি হাড়ি মহা বীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ।।
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত কায় করঞ্জা আমড়া।।
অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে।
রন্ধন কর্য্যাছ ভাল আর কিছু আছে।।
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ি।।
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল।।
ভোজন করিতে গলা করে ঘড় ঘড়।
বসন খসায় যেন মরাইর বড়।।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
হরীতকী খায়্যা কৈল মুখের শোধন।।
নিশাকাল হইল বীর করিলা শয়নে।
নিবেদিল পশুগণ রাজার চরণে।।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।

শব্দার্থ ও টীকা :

ছড়া— ছাল। পাখালি— প্রক্ষালন করে, ধুয়ে। পাথরা— পাথরের থালা, এখানে যে কোনো বস্তু দ্বারা নির্মিত থালা। 'মাটিয়া পাথরা' অর্থে মাটির থালা। খাপরা— কাঠ, মাটি বা পাথরের ছোট পাত্র-বিশেষ। উজারে— শেষ

করে। আমানি— পান্‌তা ভাতের জল, কাজি। বিট্‌কাল— কদর্য, অশোভন। তেয়াঁটিয়া তাল— তিন আঁটিযুক্ত বড় তাল।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) 'কালকেতুর ভোজন' পাঠটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(খ) 'কালকেতুর ভোজন' পাঠটির কবি কে?

(গ) 'মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে'— এখানে কে গোঁফ দুটো ঘাড়ে বেঁধেছিল?

(ঘ) এক শ্বাসে কালকেতু কয় হাঁড়ি 'আমানি' শেষ করে?

(ঙ) ফুল্লরা কে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) 'দূর হতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া'— এখানে বীর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এবং বীরের সাড়া পেয়ে ফুল্লরা কী করেছিল?

(খ) 'এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি'— কে হরিণী দিয়ে দধি এনেছে? আর সেই দধির ব্যবহার কীভাবে হয়েছিল?

(গ) 'তেয়াটিয়া তাল' বলতে কী বোঝ? তেয়াটিয়া তালের সঙ্গে কালকেতুর কী সম্পর্ক?

(ঘ) 'রন্ধন কর‍্যাছ ভাল আর কিছু আছে'— এখানে কার রান্নার কথা বলা হয়েছে? সে কালকেতুর জন্য কী কী ব্যঞ্জন তৈরি করেছিল?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) 'কালকেতুর ভোজন'-অবলম্বনে কালকেতুর ভোজনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(খ) 'কালকেতুর ভোজন'-অবলম্বনে কৌতুকরস সৃষ্টিতে কবি মুকুন্দরামের দক্ষতা আলোচনা করো।

পাঠবোধ :

কালকেতু-ফুল্লরার চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নিখুঁত চিত্রকরের ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যাধনন্দন কালকেতুর শরীরের আকৃতি, বন্য প্রকৃতি, শক্তি-সাহসিকতা, ভোজন-শয়ন ইত্যাদি বর্ণনায় মুকুন্দরাম তার আদিম চরিত্রটিকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। 'কালকেতুর ভোজন' পর্বে খাওয়ার আগে কালকেতু গোঁফ ঘাড়ে বেঁধে নেয়। এক নিঃশ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি, চার হাঁড়ি খুদ-জাউ, ছয় হাঁড়ি লাউ সহ মুসুরী সুপ ইত্যাদি ভক্ষণ করে। এই চিত্রে কবি যেমন একদিকে সরস কৌতুকরসের অবতারণা করেছেন, অন্যদিকে তৎকালীন ব্যাধজীবনের চিত্রকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

বর্ষায় লোকের অবস্থা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, “যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলকাতা শহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।” বর্তমান কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাষ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। উনিশ শতকে বাংলা কবিতা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর রচনাতে। ছাত্রছাত্রীদের সেই নতুন ধরনের কবিতা এবং রচয়িতা ঈশ্বর গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই বর্তমান কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি :

কাঁচরাপাড়ার বিখ্যাত বৈদ্য বংশে ১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ এবং মাতা শ্রীমতী দেবী। এঁদের পরিবার বিশেষ ধনী না হলেও গ্রামে সবাই মান্য করত। কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে অবস্থিত মামাবাড়িতে থাকতেন। ছোটোবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত, ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালায় পড়াশোনা বিশেষ করেননি। কিন্তু বংশগত গুণ থাকার জন্য মুখে মুখে কবিতা রচনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। সেই প্রতিভা নিয়েই তিনি একসময় কবিগানের দলের জন্যও গান রচনা করতেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চারপাশে যেসব অন্যায় অবিচার দেখতেন ব্যঙ্গের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করতে কবিতাকে হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন। সেজন্যই তাঁর কবিতায় বাস্তব ঘটনার উপস্থিতি চোখে পড়ে। তিনি খাঁটি জিনিস পছন্দ করতেন আর মেকি কিছু দেখলেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতেন। তবে মেকির উপর রাগ থাকলেও তাঁর লেখার সবটাই রঙ্গ এবং নিছক আনন্দ। চালের কাঁটা, নাটুরে মাঝি, নীলের

দাদন, পাঁঠা, মেয়েদের বিবিয়ানা, মিশনারি, পৌষপার্বণ, বাবু ইত্যাদি নানা ব্যক্তি ও বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত-র অনন্য কীর্তি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সদস্য যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাশক্তির পরিচয় পেয়ে বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুন থেকে পত্রিকাটি দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে এই পত্রিকার অবদান অপরিসীম। এই পত্রিকা ছাড়াও ঈশ্বর গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়ন', 'সংবাদরত্নাবলী', 'সংবাদসাধুরঞ্জন' নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি হল রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), হরঠাকুর, নৃসিংহ প্রমুখ প্রাচীন কবি ও পাঁচালিকারদের রচনা সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ। ১২৬২ বঙ্গাব্দে (১৮৫৫ সালে) প্রকাশিত ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ ছাড়া 'নীতিহার' গ্রন্থে তিনি কয়েকটি নীতিমূলক কবিতা ও ছোটো উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিছুটা অনুবাদ করার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তা আর হয়ে ওঠেনি। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র কবিতা-সংগ্রহ' প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান কবিতাটি সেই গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

মূলপাঠ :

রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাট ভিজে মাটী,
কোনমতে নাহি জ্বলে চূলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চূলোশুদ্ধ চোলে যায় চূলো।।

ধনির সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার।।
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার।।
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে।।
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে।
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
আমা পাগ ভিজিল উদকে।
বহুকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে।।
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ।
বাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচ তেল লুণ,
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট।।
মার এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলার,
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে।।

শব্দার্থ ও টীকা :

কান্নাহাটী— কাঁদার হাট বা জায়গা। ধনী— বিত্তশালী ব্যক্তি। সদাচার— ভালো আচরণ। তুড়ি— মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে এক ধরনের শব্দ করা। চৌকীদার— পাহারাদার। টোল— গ্রামের পাঠশালা। অড়হর— এক প্রকার ডাল। চরাচর— সমগ্র অঞ্চল, পৃথিবী। দণ্ড— সময়ের বিভাগ, এক মুহূর্ত। চোলে যায় চূলো— নষ্ট হয়ে যায়, উচ্ছন্নে যায়। আড়ী— আড় নামে এক রকম মাছ। কদাচার— অন্যায় আচরণ, অনাচার, ব্যভিচার। বিলসাধা— জেলে (ব্যঙ্গার্থে সাধারণ মানুষ)। লুণ— নুন, লবণ। বাদা— জলাভূমি। দোসর— সঙ্গী। ধনি— সুন্দরী স্ত্রী। স্থির— নিশ্চিত। দীন— গরিব, নিঃস্ব। হতবুদ্ধি— চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে যার। পাগ— পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ। পুঁতি পাঁতি— বইপত্র। মিত্রজরে— বন্ধুপুত্রকে। চাল— ঘরের ছাউনি। বাদলায়— বৃষ্টিতে। প্রমাদ— বিপদ। ঋতুরাজ— বসন্তকাল।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) ধনি শব্দের অর্থ লেখো।

(খ) ‘প্রতি হাতে মারে —।’ শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

(গ) ছুটি পাওয়ার পরও রাঙা চোখ কে দেখায়?

(ঘ) টোলে কতদিন পাঠ বন্ধ থাকে?

(ঙ) চাল কাঠ কে দেন?

(চ) বাদা কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) যজ্ঞসূত্র ধরে বিপ্রপুত্র ঋতুরাজকে কী বলেছেন?

(খ) বন্যার্ত সাধারণ মানুষ কী কী খান?

(গ) বর্ষায় রান্নাঘরের অবস্থা কেমন থাকে?

(ঘ) বন্যার সময় টোলের কী অবস্থা হয়?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) বন্যায় ধনী ব্যক্তিরা কীভাবে থাকেন তার বর্ণনা দাও।

(খ) বন্যাকে উপলক্ষ করে সমাজের ধনী ও গরিবদের মধ্যে কবি যে পার্থক্যের ছবি এঁকেছেন তা তোমার পাঠ অবলম্বনে লেখো।

(গ) বর্ষার সময় সাধারণ মানুষ কীভাবে খাবার জোগাড় করেন তা লেখো।

(ঘ) বর্ষায় লোকের যেমন অবস্থা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

পাঠবোধ :

বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ঈশ্বর গুপ্তর রঙ্গরস পরিবেশনের ক্ষমতা কেমন ছিল তা এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। সামাজিক ব্যবস্থাদির ত্রুটি তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে সহজেই ধরা পড়ে এবং সেই ত্রুটিকে ব্যঙ্গের সহজ নির্মল আনন্দে ঈশ্বর গুপ্ত কীভাবে পাঠককে ধরিয়ে দেন, তা এই কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়। কবিতাটি বর্ষণক্লান্ত বাংলা দেশের দুঃখময় পরিস্থিতি নিয়ে লেখা। চারদিক যখন জলমগ্ন, টোল-পাঠশালা সব বন্ধ, গ্রামের মানুষ শুধু শাক-অড়হর ডাল ইত্যাদি দিয়ে আধপেটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, তাদের উনুন জ্বলছে না— তখন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে সুখের বন্যা। এই শ্রেণি বৈষম্যই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র ব্যঙ্গে সরস সমালোচনায় পরিণত হয়েছে বর্তমান কবিতাটিতে।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

জীবনানন্দ দাশ

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

পাঠ্য 'বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি উৎকৃষ্ট সনেট। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লোককথা, পৌরাণিক উপাদান ইত্যাদির প্রতি কবি আজীবন যে আত্মিক টান অনুভব করেছেন, কবির সেই বিরল অনুভূতির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে পাঠটি নির্বাচন করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি :

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা নিবাসী। তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাশগুপ্ত বিক্রমপুর থেকে বরিশালে নিবাস স্থানান্তরিত করেন। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। জীবনানন্দের মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন গৃহবধূ, কিন্তু তিনি কবিতা লিখতেন। পিতা কম বয়সে স্কুলে ভর্তি হওয়ার বিরোধী ছিলেন বলে বাড়িতে মায়ের কাছেই জীবনানন্দের বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পিতার কণ্ঠে উপনিষদ আবৃত্তি ও মায়ের গান শুনতেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুবছর পর ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স সহ বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। এরপর তিনি আইন পড়া শুরু করেন, কিন্তু অচিরেই তা পরিত্যাগ করেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনানন্দের কবিপ্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মবাদী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় 'বর্ষ আবাহন' নামে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। ধীরে ধীরে কলকাতা, ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা 'কল্লোল', 'কালি ও কলম', 'প্রগতি' প্রভৃতিতে তাঁর লেখা ছাপা হতে থাকে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়। সে সময় থেকেই তিনি পারিবারিক উপাধি 'দাশগুপ্ত'-এর বদলে কেবল 'দাশ' লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসুকে লেখা একটি চিঠিতে কবিতাটিকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা', 'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার প্রধান কবি হিসাবে তিনি সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃত। তাঁকে বাংলাভাষার শুদ্ধতম কবি অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৫৭ সনে কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' প্রকাশিত হয়।

জীবনানন্দ দাশ প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে অকালমৃত্যুর আগে তিনি নিভৃতে ২১টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। 'মাল্যবান', 'সতীর্থ' ইত্যাদি উপন্যাস তাঁর সাহিত্যধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর এক ট্রাম দুর্ঘটনায় কবির জীবনাসান ঘটে।

মূলপাঠ :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম— বট— কাঁঠালের— হিজলের— অশ্বত্থের ক'রে আছে চুপ;

ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল— বট— তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল — একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

শব্দার্থ ও টীকা :

পল্লবের স্তূপ— যেখানে অনেক পাতা একসঙ্গে জমা হয়ে থাকে। হিজল— এক রকমের গাছ। ফণীমনসা— এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ। শটিবন— হলুদজাতীয় একধরনের গাছের বন। শটিগাছের শিকড় থেকে শিশুখাদ্য তৈরি হয়। চাঁদ— মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর। তিনি শৈব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। পূর্বজন্মে সংকল্প করেছিলেন মনসাদেবীর শত্রুরূপে জন্ম নেবেন। চম্পক নগরে চন্দ্রধর বণিক নামে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রবধূ বেহুলার কাতর প্রার্থনায় তিনি বামহাতে মনসাদেবীর পূজা করেন। এইভাবে মর্ত্যে মনসাপূজা প্রচার লাভ করে। চম্পা— চম্পক নগর। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি প্রাচীন রাজ্য। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য করতে সেখানে যেতেন। তমাল— কালো রঙের ছাল আছে এমন গাছ। বেহুলা— উজানী নগরের সদাগর সায়বেনের কন্যা। চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠপুত্র লখিন্দরের স্ত্রী। নেতাধোপানির সহায়তায় দেবসভায় নৃত্যগীতের সাহায্যে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে মৃতস্বামীকে ফিরিয়ে আনেন। শ্যামা— এক রকমের পাখি। খঞ্জনা— এক রকমের পাখি। গাঙুড়— ছোট নদী। অমরা— অমরাবতী ; ইন্দ্রলোক ; দেবলোক।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(খ) ডুমুর গাছের পাতার নীচে কবি কোন পাখিকে বসে থাকতে দেখেছিলেন?

(গ) শ্যামা কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) "ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে" কীসের ছায়া পড়েছিল?

(খ) "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" কবিতায় উল্লেখ আছে এমন অন্তত তিনটি গাছের নাম লেখো।

(গ) "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" কবিতায় উল্লেখ আছে এমন অন্তত তিনটি পাখির নাম লেখো।

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" কবিতা অবলম্বনে কবির অনুভূতি তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো।

(খ) ব্যাখ্যা করো—

একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

পাঠবোধ :

বাংলা মায়ের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসার ছবি এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। রূপে-গুণে তাঁর প্রিয় বঙ্গজননী পৃথিবীর যে কোনো স্থানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি বাংলার রূপ-রস-গুণে মুগ্ধ। নানা রূপ-গুণের সমষ্টিগত মহিমাকে 'বাংলার মুখ' বলা হয়েছে।

বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়

জসীমুদ্দিন

পাঠ-নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

পল্লিকবি জসীমুদ্দিন এবং তাঁর সহজ সরল ভাব ও ভাষার সঙ্গে, ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে কবিতাটি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কবিতাটি তাঁর 'হাসু' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

লেখক-পরিচিতি :

১৯০৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জসীমুদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা মৌলবি আনসার উদ্দিন মোল্লা সাহেব ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ। তাঁর মা মোসাম্মৎ আমিনা খাতুন। মায়ের স্নেহধারায় সিক্ত হয়েই জসীমুদ্দিন সরস কবিপ্রাণ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় পৈতৃক নিবাস গোবিন্দপুরের নিকটবর্তী শোভারামপুরের অম্বিকা মাস্টারের পাঠশালায়। তারপর পিতার কর্মস্থল 'হিতৈষী' স্কুলেই তিনি পড়াশোনা করেন। এখান থেকেই ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্র ও সংস্কৃত বিষয় নিয়ে বি.এ পাশ করেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় এম.এ পাশ করেন। এই বছরই রামতনু লাহিড়ি সহকারী গবেষক পদে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দীনেশচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে জসীমুদ্দিন গ্রাম্যগীতি ও গাথা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করে ১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

পিতার মতোই জসীমুদ্দিন ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তবে কোনো রকম গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিল না। পিতৃবন্ধু মনসুর মৌলবির সংস্পর্শে এসে যেমন নিজধর্মের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয় তেমনি হিতৈষী স্কুলে পড়ার সময় এক

পর্যটক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে যোগ ও সংযম অভ্যাসে আগ্রহ জন্মায়। এমনকী তান্ত্রিক সাধনা, পুরাণ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান তিনি সেইসময় অর্জন করেন। ছোটোবেলায় বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ে জসীমুদ্দিনের মনে পরোপকারের প্রবৃত্তি জেগেছিল। এ ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেও মানবসেবাধর্মে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

জসীমুদ্দিন কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রেই কবিত্বশক্তি অর্জন করেছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই তাঁর ছড়া তৈরির অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় সুবিখ্যাত 'কবর' কবিতাটি লিখে ফেলেছিলেন। নজরুল, মোজাম্মেল হক, দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকের কাছ থেকে তিনি কবিতা লেখার উৎসাহ পেয়েছিলেন। কবিকে উৎসাহিত করার জন্য অবনীন্দ্রনাথ 'নকসীকাঁথার মাঠ' কাব্যের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'রাখালী', 'নকসীকাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'মাটির কান্না' ইত্যাদি। ১৯৩৯ সালে মিসেস মেরি মিলফোর্ড-কৃত 'নকসীকাঁথার মাঠ' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ 'The Field of the Embroidered Quilt' তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছিল। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ বাংলার এই বিশিষ্ট কবি দেহরক্ষা করেন।

মূলপাঠ :

রাত দুপুরে মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ যখন হয়,
দুই নখেতে আঁধার চিরি বিজলী যখন জ্বলে ভুবনময়;
তুফান ছোটে জোর দাপটে, বৃষ্টি পড়ে মেঘের ঝাঁজর ঝরে,
বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়— মুহূর্ত সে রইতে নারে ঘরে।
বিলের জলে টাইটুবানি রোহিত কাতল মাছেরা দেয় ফাল,
কই মাগুরের দল সাঁতারে আঁকাবাঁকা ধরি গাঁয়ের খাল;
এমন সময় বছিরদ্দি একহাতেতে তীক্ষ্ণ টেটা ধরে,

আর এক হাতে মশাল জ্বালি বীর দাপটে ছোটে মাঠের পরে।
বুড়ীর ভিটায় বেড়াল ডাকে, তাল-তলাতে গলায় দড়ি দিয়ে,
মরেছিল তাঁতীর বধূ— এ সবে তার কাঁপায় নাকো হিয়ে।
শেওড়া বনে পেত্নী নাচে, হাজরাতলায় পিশাচে দেয় শিস,
বিলের ধারে আগুন জ্বালি ভূতেরা সব ফিরছে নানান দিশ।
ভয় নাহি তার কারও কাছে, রাতের আঁধার মশাল দিয়ে ঠেলে,
একলা চলে বছিরদ্দি জোর দাপটে চরণ দুখান ফেলে।
হাতে তাহার তীক্ষ্ণ টেটা, গায়ে তাহার মোষের মত জোর,
চোখ দুটিতে উল্কা জ্বলে যমদূতেরও দেখে লাগে ঘোর।

রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ মারিতে যায়—
দূর হতে তার মশাল জ্বলে ধকো ধকো রাতের কালো ছায়।
বৃষ্টি-শীলা মাথায় পড়ে, তুফান চলে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত,
রয়ে রয়ে বিজলী জ্বলে ইন্দ্র ডাকে আঁধার করি ক্ষত ;
শ্মশান-ঘাটায় পেত্নী নাচে, বটের শাখে পিশাচ দোলা খায়,
রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা :

চিরি— চিরে ; লম্বা ফালি ; বিদীর্ণ। বিজলী— বিদ্যুৎ। ঝাঁজর— ঝর ঝর শব্দে। নারে— পারে না। টাইটুকানি— টইটুম্বুর। রোহিত— রুইমাছ। ফাল— লাফ। টেটা— মাছ বিঁধে মারবার অস্ত্র। হিয়ে— হৃদয়।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) বছিরদ্দির জীবিকা কী?

(খ) রাত দুপুরে মেঘের শব্দ কীরকম হয়?

(গ) “দুই —— আঁধার চিরি বিজলী যখন জ্বলে ভুবনময়,” শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(ঘ) তুফান কিসের মতো ছোটে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) বিলের জলে কী কী মাছ পাওয়া যায়?

(খ) বছিরদ্দি কীভাবে মাছ ধরে?

(গ) কে কোথায় ফাঁসি দিতে গিয়েছিল?

(ঙ) শেওড়া বনে, হাজরাতলায়, শ্মশানঘাটায়, বটের শাখায় কারা কারা থাকে?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) 'বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়' কবিতায় কবি জসীমুদ্দিন মাছ ধরার যে সরস বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

(খ) "বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়"— কেন বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়? তারপর সে কী করে?

(গ) ব্যাখ্যা করো—
"একলা চলে বছিরদ্দি জোর দাপটে চরণ দুখান ফেলে।"

পাঠবোধ :

বাংলা কবিতায় কবি জসীমুদ্দিন একটি নতুন সুর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি পল্লি-কাব্যধারার আধুনিক কবি। পাঠ্য কবিতাটি রচিত হয়েছে গ্রাম বাংলার এক সরল, স্বাস্থ্যবান সাহসী যুবককে নিয়ে। পুরো কবিতাটিতে গ্রামবাংলার বর্ষাকালের ছবি ফুটে উঠেছে।

মায়াতরু

অশোকবিজয় রাহা

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

গাছের আর এক নাম তরু। প্রাচীনতম বাংলা কবিতায় গাছকে তরু বলা হয়েছে— 'কাআ তরুবর'। গাছ বা তরু প্রকৃতির এক বড়ো সৃষ্টি, তা সে আকারে বড়ো হোক বা ছোটো হোক। নানা আকারের গাছ আমরা দেখি শিশুকাল থেকে। প্রত্যক্ষভাবে দেখা আর কবির চোখে দেখার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, সে পার্থক্যটা ধরা পড়ে 'মায়াতরু' কবিতায়। আমাদের নিত্য দেখা গাছ দিনরাতের আলো-আঁধারে বহুরূপী হয়ে ওঠে কবিদৃষ্টির কল্যাণে। কবিদৃষ্টির অপূর্বতা বোঝানোর জন্য, সেই সঙ্গে বিদ্যার্থীর কল্পনাশক্তি জাগরণের জন্য 'ভানুমতীর মাঠ' কাব্যের 'মায়াতরু' নামের অপূর্ব কবিতাটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হল।

লেখক-পরিচিতি :

কবি অশোকবিজয় রাহার জন্ম ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর শ্রীহট্টে। ঢাকা দক্ষিণ রাহা-পরিবারের আদি নিবাস। বি.এ পাশ করে অশোকবিজয় প্যারীমোহন একাডেমিতে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৪৭-এ যোগ দেন মদনমোহন কলেজে, তারপর এলেন করিমগঞ্জ কলেজে, শেষে বিশ্বভারতীতে। ১৯৭৪-এ শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নেন।

কৈশোর থেকেই কাব্যচর্চায় মগ্ন ছিলেন অশোকবিজয়। শ্রীহট্টের সাহিত্য-আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সেনাপতি। কবির বয়স তখন অল্প, রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে তাঁর একগুচ্ছ কবিতা। উদীয়মান কবিকে বিশ্বকবি আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন এভাবে—

আকাশে চেয়ে আলোক-বর
মাগিল যবে তরুণ চাঁদ,

রবির কর শীতল হয়ে
করিল তারে আশীর্বাদ।

রুদ্রবসন্ত, ডিহাং নদীর বাঁকে (১৯৪১), ভানুমতীর মাঠ (১৯৪২), শেষ চূড়া, জলডম্বরু পাহাড়, রক্তসন্ধ্যা (১৯৪৫), উড়ো চিঠির ঝাঁক (১৯৪৬), যেথা এই চৈত্রের শালবন (১৯৬১), ঘণ্টা বাজে ; পর্দা সরে যায় (১৯৮১), পৌষ ফসল (১৯৮৩) প্রভৃতি কাব্যের মধ্য দিয়ে অশোকবিজয়ের অনন্যতার প্রকাশ ঘটেছে।

অশোকবিজয়ের কবিতা চিত্রবহুল। নদী পাহাড় অরণ্য প্রকৃতিকে তিনি প্রথম জীবনে অন্তরঙ্গভাবে পেয়েছিলেন বলে এরা তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে উঠেছিল। এত জীবন্ত প্রকৃতিচেতনা খুব কম কবির কবিতায় দেখা যায়। অল্পকথায় বর্ণময় ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্ররচনায় অশোকবিজয় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিদুষী পত্নী লীলা রায় অশোকবিজয়ের বেশ কিছু কবিতা ইংরেজিতে ভাষান্তর করে দেশে-বিদেশে প্রকাশ ও প্রচার করেন।

শুধু কবি বলে নয়, অশোকবিজয়ের খ্যাতি প্রাবন্ধিক রূপে, অধ্যাপকরূপে। তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর আসন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯ অক্টোবর ১৯৯০ কবির জীবনাবসান ঘটে।

মূলপাঠ :

এক যে ছিলো গাছ
সন্ধে হলেই দু'হাত তুলে জুড়তো ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠতো যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করতো সে গরগর
বৃষ্টি হলেই আসতো আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠতো হেসে

কোথায় বা সেই ভালুক গেলো, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

ভোর বেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কী-যে
ভেবে পাই নে নিজে,
সকাল হলো যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রুপালি এক ঝালর।

শব্দার্থ ও টীকা :

ভূতের নাচ— ভূতের অর্থ অপদেবতা, অশরীরী। এরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মানুষকে ভয় দেখায়— অনেকে এমন বিশ্বাস করেন। খুব ছন্দোময় নয় ভূতেদের ক্রিয়াকর্ম। অন্ধকারে হাওয়া লেগে গাছের মাথা এদিক-ওদিক খেয়াল-খুশি দোলে, ভয়-ভয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এমন দোলনকেই কবির মনে ভূতের নাচ বলে মনে হচ্ছে। গরগর— গলার আওয়াজ, গম্ভীর, ভীতিজনক। কম্প দিয়ে জ্বর— ক্ষণস্থায়ী কম্পজ্বরকে ভালুকজ্বর বলা হয়। এক পশলার শেষে— একবারের বৃষ্টি। হীরা— অতি উজ্জ্বল মূল্যবান রত্ন। আবছায়া— অস্পষ্ট আলো, আলো-আঁধারি। ঝিকির-মিকির— মৃদু আলোর চঞ্চল আভা।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) তরু মানে কী?

(খ) শরীরের কোন অঙ্গে মুকুট পরা হয়?

(গ) আবছায়া অর্থ কী?

(ঘ) কার শরীরে কম্প দিয়ে জ্বর আসত?

(ঙ) মাছেরা উধাও হত কখন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) 'সন্ধে নামলে' গাছটা কী করত?

(খ) ভালুকের জ্বর বলতে কী বোঝ?

(গ) ভালুকের শরীর বা মাথার সঙ্গে গাছের শরীরের মিল আছে কি? এমন মিল কখন পেয়েছেন কবি?

(ঘ) ভূতের নাচের বিশেষত্ব কী?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) 'মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ'—কথাটা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

(খ) 'মায়াতরু' নামের সার্থকতা দেখাও।

(গ) কবিতার কোন অংশটা কেন তোমার সব থেকে ভালো লেগেছে বুঝিয়ে দাও।

(ঘ) কবিতায় ক'টা ছবি আছে? প্রত্যেকটির কথা সংক্ষেপে জানাও।

(ঙ) কবি-কল্পনার অনুরূপ ভাব তোমার মনে কখনো দেখা দিয়েছে কি? দিয়ে থাকলে তার উল্লেখ করো।

পাঠবোধ :

কবি-কল্পনার এক আশ্চর্য ফসল 'মায়াতরু'। যে তরু ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়, আলো-অন্ধকারের তারতম্যের ফলে নানা ধরনের রূপচিত্র সৃষ্টিতে কবিকে উপকরণ জোগায় সে মায়াময় ঐন্দ্রজালিক তরু ছাড়া আর কী?

যোলো পঙ্‌ক্তির কবিতা জুড়ে একই তরু বা গাছের চার রকমের চেহারা। সন্ধে থেকে রাত পেরিয়ে প্রথম সকাল পর্যন্ত নানা সময়ে চেহারাগুলি কবির চোখে ধরা দিয়েছে। আমরা পাঠ করতে করতে মুগ্ধ হই—বুঝতে পারি কল্পনায় ভর করে চার চাররকমের সত্য কীভাবে মায়াজাল রচনা করল। সবই আমাদের চোখে দেখা, প্রত্যেকটিই 'সত্য' হয়ে উঠেছে আলো-আঁধার, বৃষ্টি, হাওয়ার উপস্থিতি ও তারতম্যের সূত্র ধরে। ডালপাতা, বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, খানিক বৃষ্টি, চাঁদের হাসি, সকালের আলো সব কিছু মিলে

যত ছবি তৈরি হয়েছে তার কোনোটিকেই অস্বীকার করতে পারি না। জ্যান্ত ভূত, ভালুক, মুকুট, ঝালর— কোনো রূপ বা রূপককেই অসত্য বলে ভাবতে পারি না। এমন সব কল্পনা কম-বেশি আমাদের অনেকের মনেই উঁকি দিতে পারে কিন্তু আমরা সে কথা অল্পকথায় কবিতার আকারে বলতে পারি না। অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী কবিরাই এমন সত্য-সুন্দরকে তুলে ধরতে পারেন।

ফুল ফুটুক না ফুটুক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পাঠ-নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘ফুল ফুটুক’ (প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৩৬৪, ১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘পদাতিক’ (প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৪৬, ১৯৪০) কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে পা রাখেন। সমকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্বতন্ত্র পথের পথিক। রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁর প্রথম পর্বের কবিতাগুলির নিয়ন্ত্রক। “ফুল ফুটুক না ফুটুক” এই কবিতা-পঙ্‌ক্তি বহুল ব্যবহারে আজ প্রবাদের সমকক্ষতা পেয়েছে। ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে কবি এই বাক্যটি প্রয়োগ করেছিলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর একটি সম্যক পরিচয় ঘটানো এই পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য। আধুনিক কবিতার গঠন-কৌশলের সঙ্গেও এই সূত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়ও ঘটবে। কবির চোখ কীভাবে তুচ্ছকেও মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এ কবিতায় রয়েছে তারই প্রকাশ।

লেখক-পরিচিতি :

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশ শতকের বাংলা কবিতার এক স্মরণীয় নাম। ‘পদাতিক কবি’ অভিধায় তিনি ভূষিত। কবির জন্ম বারো ফেব্রুয়ারি ১৯১৯, প্রয়াণ ৮ জুলাই ২০০৩। সুভাষ যৌবনকালে যোগ দেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। প্রথম দিককার কবিতা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদাতিক’ (১৯৪০) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। চিরস্মরণীয় ‘পদাতিক’ কাব্যের মে-দিনের কবিতার প্রথম স্তবক :

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,

চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) ও 'চিরকুট' (১৯৫০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫৭ সালে বেরলো 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কাব্যগ্রন্থ—এতে দেখা গেল এক বড়ো পরিবর্তন। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চেতনা ও গভীরতম অনুভূতিতে ধনী এই সময়ের কবিতাগুলি। এই সময়ে যে ছন্দ তিনি ব্যবহার করলেন সে-ই হয়ে উঠল পরবর্তী কাব্যধারার এক বড়ো অবলম্বন। যত দূরেই যাই, 'কাল মধুমাস', 'এস ভাই', 'একটু পা চালিয়ে ভাই', 'জল সইতে' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ জুড়ে তাঁর কবিমহিমা প্রোজ্জ্বল।

গদ্য রচনায়ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় দক্ষ। তাঁর গদ্যলেখা বৈচিত্র্যমণ্ডিত। 'আমার বাংলা' (১৯৫১), 'ডাকবাংলার ডায়েরি' (১৯১৫) তাঁর দুটি অনন্য গ্রন্থ। জেলের অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন তিনি, নাম 'হাংরাস'। অনুবাদ সাহিত্য ও কিশোর সাহিত্যেও তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। সংকলনের কবিতাটি সমনামের কাব্যগ্রন্থ 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' থেকে গৃহীত।

মূলপাঠ :

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি !

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।।

শব্দার্থ ও টীকা

শান বাঁধানো— বালি-পাথর-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। কাঠখোট্টা— নীরস। ঠুলি— চোখের আবরণ। গবাদি পশুর চোখে যে ঢাকনা পরানো হয়। উন্মুক্ত দৃষ্টির প্রতিবন্ধক। হরবোলা— যিনি অনেক রকম বুলি বলতে পারেন। এঁরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পশুপাখির ডাক নকল করে থাকেন। আইবুড়ো— অবিবাহিত/অবিবাহিতা। সাত-পাঁচ— নানারকম এটা-ওটা।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(খ) হরবোলা শব্দের অর্থ কী?

(গ) অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে কে হাসছিল?

(ঘ) রেলিঙে বুক চেপে ধরে কে সাত-পাঁচ ভাবছিল?

(ঙ) ঠুলি শব্দের অর্থ কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) "লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠি" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(খ) "গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে" কে কী করত বলে কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে?

(গ) "পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে"— কে হাসছে? সেই হাসির প্রকাশ কেমন?

(ঘ) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

(ঙ) প্রজাপতিটি কার গায়ে এসে বসেছিল? প্রজাপতিটিকে "পোড়ারমুখ" বলা হয়েছে কেন?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) আইবুড়ো মেয়েটির যে ছবি কবিতায় ফুটে উঠেছে, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

(খ) গাছের প্রসঙ্গটি কবিতায় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেছে কী? তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

(গ) কবির বসন্ত-চেতনার অভিনবত্ব নিজের ভাষায় লেখো।
(ঘ) কবিতাটির একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত করো।

পাঠবোধ :

বসন্ত ঋতুর রাজা। এ সময় ফুলে ফুলে সেজে ওঠে প্রকৃতি, মানুষের মনে সঞ্চারিত হয় প্রেম। গ্রামের সঙ্গে শহরের বসন্ত প্রকৃতিগতভাবে আলাদা। কবিতাটি নাগরিক প্রেক্ষাপটে রচিত। নাম থেকে স্পষ্ট এই কবিতা মানসিক বসন্তের জয়গানে মুখর। প্রকৃতির অদৃশ্য প্রশ্রয়ে নাগরিক মনে সঞ্চারিত হয় প্রেম। সহস্র প্রতিকূলতা অতিক্রম করে জীবন আবার আশায় বুক বাঁধে। পাথুরে ফুটপাথ দীর্ণ করে শাখামেলা গাছের ডালে ফুলের হাসি প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। এই বিজয়ের হাসিই কবির চোখে বসন্ত উৎসব। রেলিঙে দাঁড়ানো মেয়েটি এই কবিতায় বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। তার বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। সে কুরূপা। উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায় তার বিয়ে না হওয়ায় পিছনে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতাও একটি কারণ। অর্থ হারিয়ে ফেলা এই মেয়েটির জীবনেও বসন্তসন্ধ্যার লাল হলুদ আকাশ প্রেমের ইশারা দেয়। সেসময়ই এক প্রজাপতি উড়ে এসে বসে তার গায়ে। তার মনে সঞ্চারিত হয় নতুন আশা। এই আশা এবং বসন্ত কবির দৃষ্টিতে সমার্থক।

কেউ কথা রাখেনি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তাঁর কবিতার ভাষা সরল, প্রকাশভঙ্গিতে কোনো আড়ম্বর নেই, ফলে সহজেই পাঠকের হৃদয় জয় করে নেয়। সুনীল সব্যসাচী লেখক। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কিশোর সাহিত্য সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস যাতায়াত। অন্যান্য অনেক লেখকের মতো তিনিও যাত্রা শুরু করেন কবিতাকে আশ্রয় করে। শেষ পর্যন্ত কবিতা তাঁর বিশ্বস্ত সফরসঙ্গী ছিল। তাঁর কবিতার জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। "কেউ কথা রাখেনি" কবিতাটি সুনীলের বহুল-পঠিত কবিতাগুলির অন্যতম। অর্ধশতক পার করে এই কবিতাটি আজও আবৃত্তিকারদের পছন্দের তালিকায় প্রধান স্থান দখল করে আছে। সুনীলের কবিতার ভাষাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোই এই পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য।

কবিতাটি 'বন্দী জেগে আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৫ সনের ফাল্গুন মাসে। সেই সময় কবি কার্যতই তেত্রিশ বছর পার করেছেন। কিন্তু অঙ্কের সহজ নিয়মে কবিতার সমস্ত বিবৃতিকে কবির জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। ব্যক্তির জীবনকে আশ্রয় করেও কবিতা কীভাবে সর্বজনীন হয়ে উঠে এই পাঠ সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

লেখক-পরিচিতি :

বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য কবি ও কথাসাহিত্যিক। জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। কবিতায় ও গদ্যে যদিও নাগরিক উপকরণই আছে অধিকমাত্রায়, তবু কখনোই অস্বীকার করা যায় না পূর্ব-বাংলার স্মৃতিবিধুর অভিজ্ঞতার আশ্চর্য সব উপস্থিতি। সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের মঞ্চে আসেন কবিতাকে আশ্রয় করে। তিনি ছিলেন 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) কবিতাপত্রের সম্পাদক তথা 'প্রাণপুরুষ', 'একা এবং কয়েকজন' (১৯৫৮), 'আমার স্বপ্ন' (১৯৭২), 'বন্দী জেগে আছো' (১৯৫৮), 'এসেছি দৈব পিকনিকে' (১৯৭৭) তাঁর অসামান্য কবিতা-রচনাক্ষমতার সাক্ষী।

গদ্য রচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬), স্বাধীনতার পরবর্তীকালের বাঙালি তরুণের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, আশা ও জীবনযাপনের বিশ্বস্ত চিত্রণ, যৌবনের উৎসাহ, আবেগ ও প্রীতি তাঁকে বিপুল জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাস দুটি সত্যজিৎ রায় কর্তৃক চলচ্চিত্রায়িত হয়। তাঁর প্রধান গদ্য রচনাগুলির মধ্যে 'অর্জুন' (১৯৭০), 'জীবন যে রকম' (১৯৭১), 'আমিই সে' (১৯৭৪), 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' (১৯৭৮), 'সেই সময়' (১ম খণ্ড ১৯৮১, ২য় ১৯৮২) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিশোর সাহিত্য রচনায়ও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। 'সত্যি রাজপুত্র' (১৯৭৪), 'সবুজ দ্বীপের রাজা' (১৯৭৮) প্রভৃতি তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা।

২০১২ সালের শরৎকালে প্রতিভার এই বরপুত্র প্রয়াত হন। বাংলার প্রখ্যাত কবি জয় গোস্বামী সুনীলের প্রয়াণে "২৫ অক্টোবর, ২০১২" শিরোনামে এক অসামান্য কবিতা লেখেন। তার উপসংহারটি ছিল :

তুমি রইলে না
মানুষের মুখে মুখে রয়ে গেল আমাদের মধ্যেকার সেই বিষনদী
তুমি যে স্নেহের ডালা হাতে দিয়েছিলে
তা কবেই ভেসে গেছে রক্তমাখা অহং-এর জ্বরে
সমুদ্র ছাপিয়ে যাওয়া তোমার নামের পাশে
আমার ধূলিকণার নাম
শোকের সুযোগ পায় না—
অনুশোচনায় পুড়ে মরে।

মূলপাঠ :

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে
বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমী
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামা বাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো।
যেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের
ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতো চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্শা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও...
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে !
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোনো নারী !
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না !

শব্দার্থ ও টীকা ঃ

বোষ্টুমী— বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা। সাধারণত হরিনাম কীর্তন করে যাঁরা জীবিকা-নির্বাহ করেন। আগমনী— পার্বতীর বাপের বাড়ি আসা উপলক্ষে রচিত গান। চন্দ্রভুক অমাবস্যা— চন্দ্রভুক বলতে বোঝায় যে চাঁদকে ভক্ষণ করে। অমাবস্যায় চাঁদের চিহ্ন থাকে না। তাই কবি 'চন্দ্রভুক অমাবস্যা' শব্দবন্ধ নির্মাণ করেছেন। ফুঁড়ে— ভেদ করে। সুবর্ণ কঙ্কণ— সোনার চুড়ি। আতর— সুগন্ধি দ্রব্য।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) "কেউ কথা রাখেনি" কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(খ) অসমাপ্ত গানের অন্তরাটুকু শোনার জন্য কবি কত বছর ধরে অপেক্ষা করে আছেন বলে কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে?

(গ) কবিতায় উল্লেখিত মাঝির নাম কী?

(ঘ) রাস-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল কাদের বাড়িতে?

(ঙ) কবির কৈশোরের প্রেমিকার নাম কী ছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) বোষ্টুমী কবিকে কোন গান শুনিয়েছিলেন? অন্তরাটুকু কবে শুনিয়ে যাবার কথা ছিল?

(খ) নাদের আলী কবিকে কী দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন? সেখানকার বিশেষত্ব কী?

(গ) চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে কবি কী কী দেখেছিলেন?

(ঘ) বরুণা কবিকে কী বলেছিল? সে কথা রেখেছিল কী?

(ঙ) চন্দ্রভুক অমাবস্যা বলতে কী বোঝ?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) কবির জীবনের কথা না রাখার উদাহরণগুলি উল্লেখ করো।

(খ) ব্যাখ্যা করো :

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটল,
কেউ কথা রাখে না।

(গ) নিজের ভাষায় কবিতাটির একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত করো।

(ঘ) লস্কর বাড়ির ছেলেদের কোন আচরণ কিশোর কবির মনে আক্ষেপের জন্ম দিয়েছিল? সেই আক্ষেপ মিটেছিল কি?

(ঙ) কবি বাবার যে ছবিটি স্বল্প শব্দে তুলে ধরেছেন, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

পাঠবোধ :

কবিতার নাম থেকে মনে হতে পারে এটি বঞ্চিত মানুষের হতাশার খতিয়ান। কবিতাটি পাঠ করার পর সেই ধারনা বদলে যায়। কবিতায় কথা না রাখার দৃষ্টান্তগুলি বিবৃত হয়েছে একে একে। উজ্জ্বল কবিতামালা বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে তাকে ছাপিয়ে যায়। কবির স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে— আগমনী গান অসমাপ্ত রেখে চলে যাওয়া বোষ্টুমীর কথা না রাখা, নাদের আলীর তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাওয়ার কথা না রাখা, লাঠি লজেন্স, রয়্যাল গুলি কিনতে না পারার আক্ষেপ একদিন পূর্ণ হবে, বাবার দেওয়া সেই কথা না রাখা এবং কৈশোরের প্রেমিকা বরুণার কথা না রাখা। — তুচ্ছ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকরের জন্য এই ব্যাকুলতা। এসবের জাগতিক

মূল্য শূন্য, আবেগিক মূল্য অসীম। মানুষ স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। স্মৃতি সততই সুখের— এই বাক্যাংশ প্রচলিত। আসলে পার করে আসা অসময়ের রোমন্থনে নস্টালজিয়ার আনন্দ লুকিয়ে থাকে।

লক্ষণীয়ভাবে কবিতটি শেষ হয় "কেউ কথা রাখে না"— এই সিদ্ধান্তে। ব্যক্তি থেকে সমষ্টির অভিজ্ঞতাকে ছুঁতে চান কবি। সেই সঙ্গে জীবনের এক সহজ সত্য বলে মেনে নেন তাঁর ব্যক্তিগত না পাওয়াগুলিকে। এখানেই কবিতাটির শক্তি ও সৌন্দর্য।

ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। পাঠ্য গল্পটি ভুবনমোহন রায়-সম্পাদিত 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছোটগল্প রচনার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করানোর জন্য 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

লেখক-পরিচিতি :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। শিক্ষায় দীক্ষায় ঠাকুরবাড়ি ছিল বঙ্গ তথা ভারতের সবচেয়ে উজ্জ্বল পরিবার। এই পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ স্কুল শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন না কিন্তু ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে তিনি অল্পবয়সেই দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় অল্প বয়সেই তাঁর খুব সুনাম হয়।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি বিচিত্রপথে বিকাশ লাভ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখকরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধরচনা— সর্ব দিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, কিন্তু তার আগের চল্লিশ বছরে তাঁর কাব্য প্রভাতসঙ্গীত, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেদ্য, শিশু ইত্যাদি ; নাটক বাল্মীকি-প্রতিভা, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, রাজা ইত্যাদি ; উপন্যাস চোখের বালি গোরা, নৌকাডুবি (অল্প কয়েকটি গ্রন্থের নাম বলা হল) সমাদর

লাভ করেছিল বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে। গল্প ও প্রবন্ধ রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব ছিল ঈর্ষণীয়। কবির গীতাঞ্জলি কাব্য সহ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত কবিতার ইংরেজি অনুবাদের সূত্রে (মুখ্যত) রবীন্দ্রনাথ বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন।

এরপর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে পূরবী, পুনশ্চ ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ; চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে প্রভৃতি উপন্যাস; ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি নাটক— রবীন্দ্রনাথের মহিমা উজ্জ্বলতর হতে থাকে। রবীন্দ্রসৃষ্টির অন্যতম প্রধান শাখা রবীন্দ্র-সংগীত। অনেকে বলেন গীতের সংকলন গীতবিতান রবীন্দ্রসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন। এ দুটির নাম জগৎজোড়া। দেশের কল্যাণে, দশের মঙ্গল কামনায়, শাসকের নিপীড়নের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা চিরস্মরণীয়। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ দূত বলে আখ্যায়িত করেছেন, 'গুরুদেব' অভিধা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ভারতগৌরব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টি চিরকালের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে ভারতকে বিশ্বের দরবারে মহীয়ান করে রাখবে।

মূলপাঠ :

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন ; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত ; কাজেই কিল চড়-চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, 'রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে।' এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্চুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্চুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড়্‌ ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্‌।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্তদিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।'

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।'

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না ; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে ; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ

দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই— পরিষ্কার টাক তক্‌তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল ; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল ; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে ; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না ; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল ; চাকরকে বলিল, “ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্জুস কিনে আন্।”

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস সাজানো দেখিত ; দু-চার পয়সা যাহা পাইত তাহাতেই লজঞ্জুস কিনিয়া খাইত ; মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর

এক টাকায় একরাশ লজঞ্জুস কিনিয়া আনিয়া দিল ; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল 'এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক' ; আবার তখনই মনে হইল 'না কাজ নাই, এত লজঞ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।'

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে ; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল ; ভাবিল, 'চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।'

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কেবল বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন-কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বৈকি ! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন ; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া

একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের একঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল ; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াক্কড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত— সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে ; তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলের গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না ; পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া, তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল ; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোশ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ

ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দি পিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত— বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া যেখানে বুড়ামানুষেরা তাস পাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্‌গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর এক পায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, ক দিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছরদশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল !" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন উহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, “দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।”

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, “আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।”

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, “সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?”

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।”

শব্দার্থ ও টীকা :

দৈবাৎ— হঠাৎ ; দৈববশে। পেট-কামড়ানো— পেটে ব্যথা। পাঁচন— কয়েক রকমের গাছ-গাছড়ার পাতা, শিকড় ইত্যাদি সেদ্ধ করে তৈরি ওষুধ। লজঞ্জস— লজেন্স। আস্তিন— জামা বা শার্টের হাতা। দৌরাত্ম্য— দুষ্টুমি। পানাপুকুর— শেওলা-জাতীয় জলজ উদ্ভিদে ভরা পুকুর। সর্বাঙ্গ— পুরো শরীর।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পটি কার লেখা?

(খ) সুবলচন্দ্রের ছেলের নাম কী?

(গ) ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পে কে বাবা ও ছেলের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পের পিতা ও পুত্রের নাম লেখো।

(খ) শনিবার দিন সুশীল স্কুলে যেতে চাইছিল না কেন?

(গ) “বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটা ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে, উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন।”—

কেন তিনি এভাবে ঘুম থেকে উঠেছিলেন? উঠে তিনি কী দেখলেন?

(ঘ) সুশীলের কয়েকজন বন্ধুর নাম উল্লেখ করো।

(ঙ) পিতা সুবলচন্দ্র অল্পবয়স ফিরে পেলে কী করবেন ভেবেছিলেন?

(চ) পুত্র সুশীলচন্দ্র পরিণত বয়স লাভ করলে কী কী করবেন ভেবেছিলেন?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) "আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।"—উক্তিটি কার? তিনি কাদের কী ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন? তার ফলে কী হয়েছিল সংক্ষেপে লেখো।

(খ) অল্পবয়স ফিরে পেয়ে সুবলচন্দ্র কী অনুভব করেছিলেন?

(গ) পরিণত বয়স লাভ করে সুশীলচন্দ্রের অনুভূতি কীরকম হয়েছিল?

(ঘ) 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

পাঠবোধ :

'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের একটি সরস রচনা। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির নিয়ম আছে ; বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। যে বয়সের যে ধর্ম সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই উপভোগ্য। এর অন্যথা হলে তা আমাদের শরীর-মন মেনে নেয় না, বিদ্রোহ করে। এই গল্পেও সেটাই লেখক দেখিয়েছেন।

লজ্জাবতী

স্বর্ণকুমারী দেবী

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম ভারতীয় মহিলা ঔপন্যাসিক। ছোটগল্প রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। উচ্চশিক্ষিতা এবং আধুনিকমনা স্বর্ণকুমারীর রচনার আভিজাত্য, সারল্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে লেখাটি পাঠক্রমে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে এও স্বীকার্য যে 'লজ্জাবতী' গল্পটি আজকের যুগেও অনেকটাই প্রাসঙ্গিক।

লেখক-পরিচিতি :

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যখন নব্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচলন তথা ব্রাহ্মোপসনার জোয়ার এসেছে, সেইসময় ১৮৫৫ (১৮৫৬?) খ্রিষ্টাব্দের ২৮ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথের দশম সন্তান ও ঠাকুর পরিবারের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা হলেন সারদাদেবী। তবে ছোটোবেলায় স্বর্ণকুমারী মায়ের চেয়ে মেজকাকিমা যোগমায়া দেবীর সান্নিধ্যই বেশি পেয়েছেন। তিনি স্কুলে যাননি, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরেই যোগমায়া দেবীর কাছে পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি লেখাপড়া শিখেছেন। সেখানে লেখাপড়াটা মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল বলে পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন (সূত্র : 'সেকেলে কথা')। প্রতিদিন সকালে বাড়িতে সংস্কৃতজ্ঞ এবং বাংলাভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এক বৈষ্ণবী আসতেন। তিনি বাড়ির বিবাহিতা কন্যা ও বধূদের অক্ষরমালা, বানান, লিপিলিখন প্রণালি ইত্যাদি শেখাতেন। এ ছাড়া পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, আরব্যোপন্যাস ইত্যাদি বইও পড়া হত। স্বর্ণকুমারী দেবী এই পড়াশোনার আবহেই বড়ো হয়ে উঠেছেন। দাদাদের কাছেও তিনি পড়াশোনায় অকুন্ঠ উৎসাহ পেয়েছেন। বাবা দেবেন্দ্রনাথের কাছে শুরু হয়

তাঁর কবিতা চর্চা। পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারী কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, পত্রিকা সম্পাদক এবং দেশব্রতী মহিলারূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী কলকাতায় ‘সখিসমিতি’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশি পণ্যের মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধি হয়েছিলেন এবং দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করে দেশবাসীকে স্বদেশীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১২৯১ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪-১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা ‘ভারতী’ সম্পাদনা করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে তাঁর বিভিন্ন লেখা ‘ভারতী’তেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ পেয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে ‘দীপনির্বাণ’, ‘মিবাররাজ’, ‘ফুলের মালা’ ‘কাহাকে’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বারোটি সরস গল্পের সংকলন ‘নবকাহিনি’ আর ‘জীবন অভিনয়’, ‘পেনে প্রীতি’, ‘মিউটিনি’ ইত্যাদি গল্প স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যপ্রতিভার অনন্য নিদর্শন। তাঁর কিছু কিছু গল্প-উপন্যাস ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছে। নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য ইত্যাদি রচনাতেও স্বর্ণকুমারী ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ‘পৃথিবী’ তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুলাই স্বর্ণকুমারীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

মূলপাঠ :

শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোট বেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল, কোন দোষ করিলে পিতামাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন অমনি সে লজ্জাবতী-লতাটির মত সঙ্কুচিত জড় সড় হইয়া পড়িত। তাহার ছোট্ট, গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত, তাহার ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ দুটি জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার ইচ্ছায় হাসিতে চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব-শ্রী

ধারণ করিত তাই তাহার বাপ মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—লজ্জাবতী।

লজ্জাবতীর পিতা মাতা এই মধুর কোমল অভিমানের মধ্যে তাহার হৃদয় মাধুর্য্য প্রকাশিত দেখিতেন, তাই তাঁহারা সাদরে ইহার সম্মান করিয়া চলিতেন। কিন্তু শ্বশুর গৃহে লজ্জাবতীর এই অকৃত্রিম বিনয়-নম্রতা প্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জামাধুরী কখনও আদৃত হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারের নীরবতার গীতি-মাহাত্ম্য সকলের প্রাণে পৌঁছে কি?

সে ত প্রশংসার কাজ করিয়া ঢ্যাড়রা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথার ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোন কথা না কহিয়া অশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু কঠোর সংসারে কোমল অশ্রুর সাক্ষ্য কয়জন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে? ইহাতে বরং তাহার সপ্রমাণিত হয় ; সুতরাং যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতামাতার আদরের ছিল, সেই স্বভাবের গুণেই শ্বশুর-গৃহে প্রতিপদে তাড়না সহ্য করে।

শীতের প্রভাত, কিন্তু আজ কুয়াসা নাই, নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের অগ্নিগোলক জ্বলন্ত মহিমায় বিরাজিত হইয়া দিক্ বিদিক্ বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে লজ্জাবতী দেখিল, তাহার ঘরের দেওয়াল সূর্য্যকিরণে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে ; ভাবিল কতই না জানি বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, একবার মাত্র আকাশের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে সূর্য্য প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিল ; তাহার পর তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া দ্রুতপথে রন্ধন-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার 'যা' তখনও রান্নাঘরে আসেন নাই ; দাসী উনুন ধরাইয়া বাঁটনা বাটিতেছে ; সে তখন নিশ্বাস ফেলিয়া সুস্থির ভাবে কুটনার আয়োজন করিয়া লইয়া কুটা কুটিতে বসিল। সেদিন তাহার রাঁধিবার পালা নহে, বড় বৌ রাঁধিবেন সে যোগাড় দিবে মাত্র। তাহার কুটনা কুটা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই সময় শ্বাশুড়ী আসিয়া সহাস্য মুখে কোমল স্বরে বলিলেন— "বৌমা, শুনেছ—"

দ্বাদশ বৎসর লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে— এমন সাদরে শ্বাশুড়ী তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে নাই, সেই তাঁহার দিকে

চাইতে গিয়া থতমত খাইয়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল।— শ্বাশুড়ী বলিলেন, "শুনেছ ফুলকুমারী আসছে—?" লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইয়া আশ্চর্য্যব্যঞ্জকস্বরে বলিল— "ঠাকুরঝি !"

আশ্চর্য্য হইবার কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়া অবধি কখনও এ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর হইল ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে— বিবাহের পর একবারও সে বাপের বাড়ী আসে নাই, শ্বশুর ধনী লোক, পুত্রবধূকে এই গৃহস্থ ঘরে পাঠাইতে অপমান জ্ঞান করিতেন, শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাই এতদিনে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিতেছে। শ্বাশুড়ী আবার বলিলেন, "আজ কার রাঁধার পালা? বড় বৌয়ের বুঝি? তা দেখো বৌমা, বড় মানুষের বৌ— এতদিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কম না হয়।"

শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে চুবাইয়া ধরিয়া লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল 'আজ যে সুপ্রভাত আনিয়াছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী ঊষাময়ী প্রতিমা। তাহার আগমনে এই কঠোর অন্ধকার প্রান্তর এতদিনে বুঝি প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া উঠিবে !'

এক অপূর্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একে কন্যা, তাহে ধনীর ঘরণী, গৃহে আসিতেছে আবার অনেক দিনের পর;— চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুরে আজ পর্ব্বোৎসবের ধুম, কাহারো মুহূর্ত দাঁড়াইবার অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত, দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া আনন্দ-কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি আসছেন গো।"

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,— লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতা বেড়ী ফেলিয়া মাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বার দেশে আসিয়া উঁকি মারিল। রন্ধন-গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত পালকী,— অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান্ এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার-বিভূষিতা দুই দাসী, উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জাবতীর স্ফীত হৃদয় সহসা দমিয়া গেল,— ধনীর নিকট দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা সম্পর্ক— হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পারে?

কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই আড়ম্বরের মধ্যে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লময়ী অসামান্য রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন নিমেষে তাহার বিরস ভাব দূর হইল, হৃদয় এক উত্তাল আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলুদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল, বড় বৌ রাগিয়া বলিলেন, 'ও আবার কি সোহাগীপণা।" সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়ের রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কাজের সময় ওসব ন্যাকামি ভাল লাগে না, কি হাসিই পেয়েছে।" ছোট বৌ বুঝিল, কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বড় বৌ আবার বলিলেন, "ভালো আদুরেপণা শিখেছিলি। আদুরেগিরি ফলাতে হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ফলাস; আমাদের ওসব ভাল লগে না"— এই কথায় তাঁহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহার স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

আর লুকাইয়া এত তরফা দেখা নহে— এবার চোখে চোখে মিলন। বধূরা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীর নবনী, দধি, দুগ্ধ, ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন স্থানে লইয়া আসিলেন। আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমারী বড় বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ কি করেছিস্ লো, এত কেন ! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি?"

বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোমটার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল, 'তা নইলে এতদিন পরে বাপের বাড়ী আসিস্? এখন বোস্, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকলেই বুঝব রুচলো না।"

"মরে যাই, আমি কি রাক্ষস নাকি? ও কে, বড় বৌ?"

মা তাহার উত্তর-স্বরূপ বলিলেন, "তা জানিস্ নে ফুলি ! ও ছোট বৌ ! কি করেই বা জান্‌বি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমের বিয়েতেও ত একবার পাঠালে না, এত করে বললুম— তা একবেলাও না, এমন জান্‌লে কি অমন ঘরে মেয়ে দিই□”

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "এই

আমাদের ছোট বৌ! দেখি লো দেখি, মুখ খোল,” বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোমটা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোমটা টানিয়া দিল। ফুল বলিল, “ওমা বেশ বৌ হয়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!” ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এক কথা বলিল, ছোট বৌ হাসিয়া মুখ হেঁট করিয়া ঘিয়ের বাটী ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

কাজ কর্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে, ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের সেই প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুর কথা সমস্তক্ষণ তাহার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছে— লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় সলজ্জ আগ্রহে অধরের মৃদু হাসি চাপিয়া অধীর চরণ ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিয়া দোতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় পুঁটুরাণী আসিয়া বলিল, “মা আমার ফুল কাঁটা ফিতে দে, পিসিমা চুল বেঁধে দেবে।” লজ্জাবতী সহসা স্বপ্নরাজ্য হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। বিস্মিতভাবে বলিলেন, “সে কি, তোর ফুল কাঁটা ত আমি রাখি নি!” মেয়ে বলিল, “রাখিসনি কি। সেই যখন তুই কুটনো কুটছিলি আমি তোর কাছে রেখে এলুম!”

“কই আমি, তা জানিনে; আমাকে ত ব’লে আসিস নি?” মেয়ে বলিয়া আসে নাই সেটা ঠিক! কিন্তু মা যে তুলিয়া রখেন নাই সেটা ত আর তাহার দোষ নহে। সে মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, “কাছে রেখে এলুম— তা তার বলে আসব কি! শীঘ্র আমার দড়ি কাঁটা দে।” লজ্জাবতী নিজের দোষটাই মনে মনে মানিয়া লইয়া, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া খুঁজিতে আবার নীচে নামিলেন,— আর ফুলকুমারীকে দেখিতে যাওয়া হইল না।

এদিকে দাসী আসিয়া গৃহিণীকে বললি, ‘দিদিমণির বিছানা ত করে এনু— তা গায়ের নেপ কি দেব— একটা দাও।” ফুলকুমারী তখন বড় বৌয়ের ঘরে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল। গৃহিণী একাকী ছিলেন; দাসীর কথায় তিনি তাহার তলপী তলপা খুঁজিয়া একটি ভাল লেপ পাইলেন না,— সব ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতা চলে, কিন্তু বড় মানুষের বৌকে গায়ে দিতে দেওয়া যায় না। গৃহিণী ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তবে বিপদে পড়িলে যাঁহার বুদ্ধি না যোগায় তিনি স্ত্রীলোকই নহেন; মুহূর্তের মধ্যেই আবিষ্কৃত হইল, দাসীকে

বলিলেন, "দ্যাখ, আজ ত হেম পশ্চিমে যাবে, ছোট বৌয়ের গায়ের নেপটা ফুলির বিছানায় দিগে, আর এর একটা আমি বেছে রাখি—এসে তখন ছোট বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাস্।"

দাসী চলিয়া গেল, খানিক পরে আসিয়া বলিল,— "এমন আগোছাল বৌও দেখিনি। পুঁটুরাণী গহনা রাখতে দিয়েছিল— তা হারিয়ে খুঁজতে নেগেছে, তাই তাকে আর বলতে পেনু না ; আপনিই নেপটা নিয়ে দিদিমণির বিছানা করে এনু।"

"গহনা হারিয়েছে ! কি গহনা?"

"মাথার ফুল গো ফুল। দেখ" মা আমাদের শেযে দয়ে মজিও না। তোমরা সব হারাবে— আর আমরা গরীব মানুষ যেন মারা না যাই।"—

গৃহিণী এই খবরে রাগিয়া আগুন হইলেন, আজ আনন্দের দিন, মেয়ে ঘরে আসিয়াছে— আর কিনা পোড়ার মুখী বৌ গহনা হারাইয়া অলক্ষণ করিয়া বসিল। তিনি প্রথমে বড় বৌয়ের ঘরে আসিয়া খবর দিলেন— "শুনেছিস্? ছোট বৌ গহনা হারিয়েছে ! এই সেদিন চেলির কাপড় খানা হারালে আবার আজ এই কীর্তি। এমন উড়নচণ্ডী বৌ"—

ফুল বলিল, "মা, তা বৌ ত আর ইচ্ছে করে হারায় নি।"

ফুলকে তাহার পক্ষ লইতে দেখিয়া মায়ের রাগ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তুমি ত বাছা বৌয়ের গুণ জান না তাই ওকথা বলছ, দিন কতক থাক তখন বুঝবে ! দেখতে মুখখানি অমন— পেটে পেটে দুষ্টমি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছে ! আর গহনা ত ওর যাবে না, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন ! তুই আজ বাড়ী এসেছিস তাই ইচ্ছে করেই অলক্ষণ করছে।"

বড় বৌ কোন কথা কহিল না ; ফুলকুমারী বলিল,— "আচ্ছা দেখে আসি ব্যাপারটা কি হয়েছে?" তিন জনে মিলিয়া তখন ছোট বৌয়ের সন্ধানে চলিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না, ছোট বৌ নীচের সব ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইতেই শ্বাশুড়ীর তীব্রস্বর তাহার কাণে পৌছিল— "কি গহনা আবার হারিয়েছিস্ ! (যেন চিরকাল ধরিয়া সে গহনাই হারাইয়া আসিতেছে !) বাড়ীতে আর লক্ষ্মী রইলো না। পরের বাড়ী মেয়ে পাঠানই বা যাবে কি করে? শ্বশুররা যখন বলবে আমাদের গহনা কি হলো তখন লজ্জায় না মুখ কালী হয়ে যাবে।"

লজ্জাবতী মৃদুস্বরে বলিল, "ওর শ্বশুর বাড়ীর গহনা নয় ; আমার বাবা আমাকে যে ফুল দিয়েছিলেন তাই পরিয়ে দিয়েছিলুম।"

"বটে ! তোমার বাবা তোমায় যা দিয়েছেন তাই হারিয়েছে? তা আমরা কথা কয়েছি ঘাট হয়েছে। দোষ করলেই কথা কইতে হয়— তা কথা কইলেই অমনি বাপের বাড়ীর তুলনা ! দেখলি বাছা ফুলি, দেখ— একবার তোর মায়ের অপমানটা দেখ"—

বড় বৌ বলিল, "হলেই বা বাপের বাড়ীর গহনা, জিনিসটা ত হারাল !"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "হারাক্— হারাক্ সব যাক, আমাদের কথা কয়ে কাজ কি? বলব কি, হরিমোহন ঘোষের মেয়ে আমি— তাই,— অমন বৌ নিয়ে ঘর করছি ! নইলে আর কেউ হলে বাপ বাপ ডাক ছাড়ত ! আয় বাছা, তোরা কেউ কথা ক'সনে।"

শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন, ঘরে গিয়া সেই কথা লইয়াই গুলজার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবু সেদিন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন ; সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সেই সকল তাঁহার কাণে উঠিল, মা নানা কথার পর বলিলেন— "বাছা তোদের ত এখন ঘর সংসার হয়েছে, আমাকে ত আর দরকার নেই,— আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এখানে থেকে এসব অপমান আমার আর সয় না।" ছোট বাবু ছোট বৌয়ের ব্যবহার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, গোলযোগের আর ছাই কি দিন ছিল না, আজ বিদেশ যাইবার দিনে যত হেঙ্গাম। তিনি ত গৃহে গিয়াই ছোট বৌকে বকিতে লাগিলেন। কেবল বকিলেই রক্ষা ছিল,—বলিলেন, "আমি আর এরূপ গোলযোগ সহিতে পারি না, এই চলিলাম আর ফিরিব না।"

স্বামীকে যদি লজ্জাবতী সব খুলিয়া বলে ত এতটা কিছুই হয় না; কিন্তু স্বামীর কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়া উঠিল যে মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। বিদায় দিনে এইরূপ স্নেহসম্ভাষণ জানাইয়া স্বামী যখন চলিয়া গেলেন সে বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহার উপায় কি। যেরূপ ভাগ্য লইয়া সে জন্মিয়াছে।

চতুর্দশ বৎসর পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছে, তাই আপনার বাড়ী হইয়াও এ বাড়ীর সবই যেন তাহার চোখে নূতন। মায়ের সে শ্রী নাই, তিনি এখন বৃদ্ধা, বালিকা বড় বৌ এখন গৃহিণী, দাদারা সব বড় হইয়াছেন,

ঘরে ঘরে বালক বালিকার নবমুখ— সকলই তাহার কাছে নূতন, সর্বাপেক্ষা নূতন লজ্জাবতী, এবং তাহার প্রতি বাড়ীর ব্যবহার ! সে যেন ছাই ফেলিতে ভাঙাকুলা, তাহাকে যা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্যন্ত— এমন কি দাসীরা পর্যন্ত বকে ! তাহার কি দোষ, কোন দোষ আছে কিনা ইহা বিচার করিয়া দেখাটাও কেহ আবশ্যক বিবেচনা করে না,—লজ্জাবতীও কখনও নিজের দোষের প্রতিবাদ করে না।

ফুলকুমারী অবাক হইয়া গেল— তাহার হৃদয় মমতার্দ্র হইয়া পড়িল। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ হইয়া মাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু দেখিল বৃথা চেষ্টা, মা তাহাতে আরও বেশী রাগিয়া যান। এদিকে নিষ্ফল হইয়া সে সন্ধ্যার পর লজ্জাবতীর কক্ষে গমন করিল, যদি কোনরূপে তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। গৃহ-দ্বারে আসিবা মাত্র দাদার রুষ্টস্বর তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, ফুলকুমারী ভিতরে না গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইল। তখনই প্রায় দাদাকে গৃহের বাহিরে আসিতে দেখিয়া বলিল, "দাদা, বৌকে বকছ, আমি তা বৌয়ের কোন দোষ দেখছিনে"—দাদা সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে দোষ কার ?"

"দোষ যদি ধরতে হয় ত পুঁটুরাণীর, নইলে কারো নেই। সে যদি বৌকে গহনার কথা বলে, তাহলে ত আর চুরি যায় না।"

"কিন্তু মায়ের মুখের উপর অমন চোপা করার কি দরকার ছিল ?"

ফুলকুমারী একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দাদা, সেটা ঠিক চোপা নয়, মা যদি বুঝে দেখতেন, তাহলে তাতে রাগ করতে পারতেন না, তবে এখন বুড়ো হয়েছেন এক বুঝতে আর এক বুঝে বসেন। কিন্তু তাই বলে তুমিও দাদা ভুল বুঝ না। কি হয়েছে বলি শোন।" কি কথার পর লজ্জাবতী মাকে কি বলিয়াছিল, ফুলকুমারী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি ওর দোষ পেলে ?"

"না।"

"তবে ভেবে দেখ দেখি, বিনা দোষে তুমি পর্যন্ত ওরূপ করে বক্‌লে ওর কিরূপ কষ্ট হয়। বিশেষ করে আজ বিদেশে যাবার দিন ওকে বকে যাচ্ছ, তোমার একটু মায়া করে না দাদা ?"

দাদা আর কিছু না বলিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন; শয্যার পাশে

আসিয়া দেখিলেন লজ্জাবতী কাঁদিতেছে, নিকটে বসিয়া কহিলেন, "লজ্জাবতী, তুই কি চিরকাল লজ্জাবতী থাকবি? এককক্ষণ সব খুলে বললেই ত আমি বুঝতুম তোর দোষ নেই। যা হয়েছে, ভুলে যা লক্ষ্মীটি, আর কখনও তোকে বকব না, আমায় মাপ কর !" লজ্জাবতী গভীর সুখে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন— রাত্রি গভীর,— চারিদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু লজ্জাবতীর নিদ্রা আসিতেছে না ! গভীর কষ্টের পর স্বামীর প্রেমাদর পাইয়া কৃপণের ন্যায় সে তাহা এখনও আস্তে আস্তে উপভোগ করিতেছে। এক একবার তাহার আশ্চর্য মনে হইতেছে, স্বামী সব কথা কি করিয়া জানিলেন?— কে বলিল? সহসা সে চমকিয়া উঠিল, ফুলকুমারী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল, 'বৌ, এখনো বিছানায় যাস্‌নি।" স্বামীকে বহির্বাটীর দ্বার পর্যন্ত পঁহুছিয়া আসিয়া সেই যে সে নীচে সতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়াছে— আর ওঠে নাই। ফুলকুমারীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি এখন শোওনি?"

"ঠাকুরঝি বলিলেন, আমি শুয়েছিলুম, বিছানা থেকে উঠে তোকে দেখতে এলুম, দাঁড়া প্রদীপটা কাছে আনি, ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছে না।" ফুলকুমারী দীপটা নিকটে আনিয়া ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া নিকটে বসিল, বসিয়া বৌয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "তোর না ভাই বারো বছর বিয়ে হয়েছে? আচ্ছা তখন কি তুই এর চেয়েও ছোট ছিলি? তোকে এখনও এমন ছোট দেখতে। মনে হয় যেন কনে-বৌটি।" বৌ একটু হাসিল— ননদ তাহার হাতটি হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল, "তুই ভাই অমন কেন?"

"কেমন?"

"যেখানে তোর দোষ নেই সেখানেও কথা ক'সনে?"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয়, কে জানে আমি কি রকম করে বলি— সবাই ভুল বোঝে?"

"দাদাও? কেন আমি দাদাকে বুঝিয়ে বলতে ত তিনি সব বুঝলেন?

তবে ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ লইয়া স্বামীকে সব কথা বলিয়াছে। তাহার জন্যই সে স্বামীর আদর পাইয়াছে। কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন

অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তিনি কিছু বললে আমার বড় কান্না পায়।"

"তাইতে কোন কথা মুখ ফুটে বলা হয় না? বুঝেছি।"

"না তা ঠিক না, তিনি বিরক্ত হ'য়ে তারপর আর জিজ্ঞাসা করেন না।"

"হায়রে আমার অভিমানিনি। কে জনে ভাই তোকে সবাই বকে কি করে! কি করে তোর উপর রাগ করে!"

"দিন কতক পরে তুমিও বকবে। দেখবে আমার উপর রাগ না করে লোক থাকতে পারে না।"

"কক্ষনো না।"

"যদি দোষ করি?"

"তা হলেও না। তোকে যে সকলেই বকে— আমি আবার কোন প্রাণে বকব।" লজ্জাবতী তাহার হাত দুটি ধরিয়া টিপিয়া বলিল, "তাও নাকি কখনও হয়।"

আনন্দ-সজল নেত্রে খানিক পরে ফুলকুমারী চলিয়া গেলেন, বৌ বিছানায় গেল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা, স্বামীর আদর, ফুলকুমারীর সস্নেহ বাক্য, অকৃত্রিম সখীত্বভাব তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে লাগিল ; সুখের চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইল।

ভোর বেলা উঠিতে গিয়ে দেখিল মাথা বড় ঘুরিতেছে— আবার সে শুইয়া পড়িল। ফুলকুমারী সকালে গৃহে আসিয়া বৌকে তখনও শয্যায় দেখিয়া দরজাটা একটু খুলিয়া যখন উঁকি মারিল, লজ্জাবতী তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। লজ্জাবতীকে নিতান্ত বিবর্ণ, ক্লান্ত দেখিয়া ফুলকুমারী বলিল, "বৌ, তোর কি অসুখ করেছে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি বলিল, 'না।'

ফুলকুমারী বলিল, "কিন্তু তুই যে কাঁপছিস্, শীত করছে? গায়ে কাপড় দে না।"

লজ্জাবতী বিছানার এদিন ওদিক চাহিয়া বলিল, "আমার নেপটা কই দেখেছিনে ত"— গোলমালে শ্বাশুড়ী প্রদত্ত লেপটি দাসী তাহার জন্য আনিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"ওমা, সারারাত নেপ না গায়ে দিয়ে অমনি কাটিয়েছিস্। কেন তোর নেপ কোথায় গেল?"

"জানিনে, ঝি বুঝি শু'কতে দিয়েছিল, তুলে দিতে ভুলে গেছে"— বলিতে বলিতে লজ্জাবতী বিছানার বাহির হইল। ফুলকুমারী তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "সত্যি বৌ, তুই এখন উঠিস্‌নে, শুয়ে থাক, তোর কপালটা যেন গরম গরম মনে হচ্ছে।"

বৌ হাসিয়া বলিল, "এখন শুয়ে থাকলে কি চলে? ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে, স্নান করলেই সেরে যাবে এখন।"

"কেন— চলবে না কেন? আজ বুঝি তোর রাঁধার পালা? তা অসুখ করলেও পালা রাখতে হবে নাকি? আমি রাঁধব এখন।"

লজ্জাবতী জিব কাটিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি— ক্ষেপেছ নাকি? সত্যি আমার কিছু হয় নি।" এমন আজগুবি অসম্ভব প্রস্তাব সে যেন জীবনে কখনো শুনে নাই। বলিতে বলিতে সে খাটে বসিয়া পড়িল। ফুল বলিল, "আমার মাথা খাস তুই শো,—"

এমন সময়ে দাসী একটা লেপ আনিয়া বিছানায় ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার নেপ রইলো গো,— কাল আনতে ভুলে গেছনু— তা উনুন যে বয়ে যাচ্ছে আজ কি আর রান্না বান্না করতে হবে না?"

লজ্জাবতী বলিল, "চল যাচ্চি।"

দাসী গেল, ফুল বলিল, "আমার কথা রাখবিনে, তবু রাঁধতে যাবি!"

বৌ কাতর হইয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি রাঁধবে সে কি করে হবে?"

"কেন তাতে কি হয়! তবে আমি তোর এত পর—বেশ!" এই কথা বলিয়া ফুল রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, লজ্জা বলিল, "শোন ঠাকুরঝি—না, তা নয়। কিন্তু মা তাহলে রাগ করবেন, তিনি ভাববেন—"

"তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া সে আমার।"

লজ্জাবতী একটু ভাবিল— ভাবিয়া সেই প্রস্তাবের অসম্ভব্যতাটা মনে মনে কল্পনা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ছি ছি তাও কি হয়! না ঠাকুরঝি, সে কোন মতে হবে না।"

"কোন মতে হবে না! বেশ তুই রাঁধলে আমি কিন্তু সে রান্না খাব না।" ফুল রুষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল,— লজ্জাবতী ডাকিল—

'ঠাকুরঝি !" কিন্তু ফুল আর ফিরিল না। লজ্জাবতী আর পারিল না— সে তাহার ঘূর্ণ্যমান উত্তেজিত উষ্ণ মস্তক লইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। এখনও একদিন যায় নাই ইহার মধ্যে ঠাকুরঝিও তাহার উপর রাগ করিল। সে বুঝিল এ রাগ ঠাকুরঝির স্নেহপ্রসূত,—কিন্তু তবুও তাহাতে তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইল, দুঃখ অভিমানে অশ্রু উথলিয়া উঠিল, কাঁদিয়া মনে মনে সে কহিল, ঠাকুরঝিও আমার উপর রাগ করিল। আমার মরণই ভাল।

লজ্জাবতী খানিক পরে নীচে রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল, ফুল উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বড় বৌকে রান্না সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছে— বড় বৌ কুটনা কুটিতে হাসিয়া উত্তর করিতেছেন। ফুলের বাঁহাতী উনুনে ডালের হাঁড়ি— ডানদিকে কড়ায় তেল ফুটিতেছে— সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বৌ লো ! তেল চড় বড় করে এলো এখন তরকারী গুলো দিই?" বউ হাসিয়া বলিতেছে, "বলি তোমার অমন কাজ না করলেই কি নয় ! চড়বড়ানি আগে থামুক্ তখন দেবে— "ফুল বলিল, "ঐ লো বউ ডাল উথলে উঠলো ! কি করি আয় আয়—"

লজ্জাবতী বলিল, "এই যে আমি আসছি ঠাকুরঝি। সে আসিতে আসিতে ডাল উথলিয়া খানিকটা ফুলের পায়ে পড়িয়া গেল। পা পুড়িল ফুলের, তাহার জ্বালা ভোগ করিল যেন লজ্জাবতী, এই ঘটনায় এমনই সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি তাহারা শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শ্বাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা তাই ত ! সত্যিই ফুলকুমারী রান্‌ছে— আমার বিশ্বাস হয়নি। আবার পা পুড়িয়ে ফেলেছে। বলি সব রাজার ঝি'রা। ননদ দু'দিন মাত্র থাকতে এসেছে তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হ'ল না।"

বড় বৌ বলিল, "আমি ত সেই অবধি বারণ করছি, তা ঠাকুরঝি ত শোনে না কি করব? ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে না পারে— আমি রাঁধছি, তোর কেন বাপু আসা!"

শ্বাশুড়ী! "ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে তাই উনি রাঁধতে এয়েছেন ! দেখ ফুলি, আমি আজ মাথামুণ্ড খুঁড়ে মরব ! এদিকে আয় বলছি, মাইরি— এমন বৌও তো আমি কখনও দেখিনি।"

বড় বৌয়ের প্রতি ফুল ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাকে বলিল, “না মা আমি সখ্ করে রান্‌তে এসেছি, আমি এই ডাল আর তরকারিটা রেঁধে যাচ্ছি— তুমি যাও।”

মা বলিলেন, “তুমি রাঁধবে, আর বৌরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে? আয় বলছি, নইলে আমি রক্ষে রাখব না’—বলিয়া হেঁসেলে উঠিয়া ফুলের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং সমস্ত বেলা ধরিয়া তাহাকে এমন চোখে চোখে রাখিয়া দিলেন যে ফুলের আর লুকাইয়াও এ মুখো হইবার যো রহিল না।

লজ্জাবতী তাহার অসুস্থ শরীর লইয়া নিস্তব্ধে রাঁধিল, কিন্তু রান্নার পর গৃহে আসিয়া সেই যে শুইয়া পড়িল, আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

বড় বৌ ফুলের ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া আসিল। পুঁটুরাণী পিসিমাকে ডাকিল, “পিসিমা ভাত এসেছে খাওসে গো।” মা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আহার স্থানে আসিয়া ছোট বৌকে না দেখিয়া বলিলেন, “রাজার ঝি’র বুঝি আর এদিকে আসতে নেই।” পুঁটুরাণী বলিল, “মায়ের বড় অসুখ করেছে সে শুয়ে পড়েছে।”

শ্বাশুড়ী বলিলেন, “সব ভান, কাজের নামে অমনি অসুখ।”

তাহার অসুখের কথা শুনিয়া ফুলের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল— বুঝিল বিশেষ অসুখ না হইলে সে এখানে আসিত। সে বলিল, “না মা, সকাল থেকে তার অসুখ করেছে—রেঁধে ভাল করেনি, একটা বাড়াবাড়ি না হয়।”

মা বলিলেন, “অমনি বাড়াবাড়ি হলো। একটু বুঝি মাথা ধরেছে আর পড়ে আছে। গেরস্থের বাড়ী অত বড়মানুষী কল্লে চলে না।”

ফুল আর কিছু না বলিয়া আহারের পর তাহার গৃহে গমন করিল, মাও তাহার সঙ্গ লইলেন। লজ্জাবতীকে দেখিয়া শ্বাশুড়ীর জ্ঞান জন্মিল যে, সে সত্যই পীড়িত। ফুল তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, ‘উঃ ! আগুন যে ! বৌ শীতে কাঁপছে, লেপটা আবার গেল কোথা? কাল ত বৌয়ের বিছানায় মোটেই লেপ ছিল না—সারারাত শীতে সারা হয়ে আসলে এ অসুখটা হয়েছে।”

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বড় মানুষের ঝি। একটা নেপ দিয়েছিলুম তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। গেরস্থঘর এক দিন কি নিজের ভাল লেপটা নইলে চলে না। না হয় ননদকেই গায়ে দিতে দিয়েছিলুম— তার জন্যে একেবারে অসুখ বাধান।"

লজ্জাবতী জানিতই না যে শ্বাশুড়ী তাহার লেপের পরিবর্তে অন্য লেপ তাহাকে দিয়াছেন। সুতরাং সকালে রন্ধন-গৃহে যাইবার সময় বিছানা তুলিতে গিয়া ছেঁড়া লেপখানা দেখিয়া ভাবিল, দাসী লেপটা বদল করিয়া আনিয়াছে— তাই পুঁটুরাণীকে দিয়া লেপটা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফুল বলিল, "সে যা হোক, এখন একটা নেপ পাঠিয়ে দেও দেখি।" শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন। ফুল লজ্জাবতীর সেই করুণ কাতর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন, আমি জোর করে রাঁধলুম না, তাহলে ত তোর অসুখ হতো না।"

লজ্জাবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,— সে বলিল, "না আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বলি দিদি, তোমার আর রাগ নেই— তুমিও ভাই আমার উপর রাগ করলে !"

ফুলকুমারী কাঁদিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "আর আমি কখনো রাগ করব না— বল ভাই, তুই কিছু মনে করবি নে !"

লজ্জাবতী কোন কথা কহিল না, তাহার মাথা ফুলের রাখিয়া গভীর প্রশান্তসুখে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে এক হইয়া, দুজনে অশ্রুজলে অশ্রুজল মিলাইল !

বুঝিবা লজ্জাবতীর কাঁদিবার সাধ মিটিল। ইহার পর আর সে কাঁদিল না,—স্বামী যে কথা দিয়াছিল, ফুল যে কথা দিয়াছিল তাহা ঠিক রহিল— আর লজ্জাবতীকে তাঁহাদের বকিতে হইল না।—কয়েক দিনের মধ্যেই লজ্জাবতী রোগ-শয্যা হইতে একেবারে চিতা-শয্যায় শয়ন করিল।

শ্বাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আহা গেলো গো—নিজের দোষে প্রাণটা খোয়ালে। রাগ করে নেপটা গায়ে দিলে না গো। রাগ করে বল্লে না যে অসুখ করেছিল।"

দাসী, চাকর, যা সকলেই এই এক ধূয়া ধরিয়া কাঁদিলেন,—কেবল একটি গভীর শোকক্লিষ্ট, অনুতপ্ত হৃদয় তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া নির্জ্জনে

মর্মান্তিক দুঃখের অশ্রুবর্ষণ করিয়া মনে মনে কহিল, "হায় হায়, কি করিলাম ! কেন তাহার উপর রাগ করিয়াছিলাম। বুঝিবা সে ঐ অভিমানেই গেল— বুঝি আমিই তাকে মারিলাম ! একবার মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি— একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই,— আদরের ভিখারিণী, তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না ; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত মর্ম্মে মর্ম্মে বিধিয়া থাকিবে।"

শব্দার্থ ও টীকা :

নবনী— ননী, মাখন। অধীর চরণ— চঞ্চল পায়ে। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন — বাংলা প্রবচন। হেঙ্গাম— হাঙ্গামা। বিদীর্ণ— ছিন্ন ; খণ্ডিত ; ভগ্ন। প্রবিষ্ট— যে প্রবেশ করেছে। ঘূর্ণ্যমান— যাকে ঘোরানো হচ্ছে; যা সমানে ঘুরছে।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) 'লজ্জাবতী' কার লেখা?

(খ) লজ্জাবতীর ননদের নাম কী?

(গ) ফুলকুমারী বিয়ের কতদিন পর বাপের বাড়ি এখেছিল?

(ঘ) 'হরিমোহন ঘোষের মেয়ে আমি'— কে এই কথা বলেছে?

(ঙ) লজ্জাবতীর মেয়ের নাম কী?

(চ) লজ্জাবতীর স্বামীর নাম কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) "তা দেখো বৌমা, বড় মানুষের বৌ— এতদিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কম না হয়।"
— কার উক্তি? বড় মানুষের বউ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(খ) "ও আবার কি সোহাগীপণা"— কে, কাকে, কেন একথা বলেছে?

(গ) “ঠাকুরঝি ক্ষেপেছ নাকি?” ঠাকুরঝির নাম কী? কে তাকে কেন একথা বলেছে?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) “বড় মানুষের ঝি। একটা নেপ দিয়েছিলুম তা ফেরত দেওয়া হয়েছে।” কাকে উদ্দেশ করে কে এই কথা বলেছেন? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ঘটনাটি বিশদ করো।

(খ) লজ্জাবতীর চরিত্র চিত্রণ করো।

(গ) লজ্জাবতীর ও ফুলকুমারীর সম্পর্কের পরিচয় দাও।

(ঘ) লজ্জাবতীর শাশুড়ির চরিত্র চিত্রণ করো।

(ঙ) ‘লজ্জাবতী’ গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

(চ) ‘লজ্জাবতী’ একটি করুণ রসের গল্প। গল্পটি আলোচনা করে মন্তব্যের সার্থকতা বিচার করো।

(ছ) ব্যাখ্যা করো—

(i) বলি সব রাজার ঝি’রা। ননদ দু’দিন মাত্র থাকতে এমেছে, তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হ’ল না।

(ii) একবার মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি —একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই, —আদরের ভিখারিণী, তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না ; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া থাকিবে।

পাঠবোধ :

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে অধিকাংশ নারীই স্বামীগৃহে অত্যাচারিত ছিলেন। ‘লজ্জাবতী’ গল্পটি তারই একটি উদাহরণ। আবার অতিরিক্ত লজ্জাশীলা বলেই যে লজ্জাবতীর এমন করুণ পরিণতি ঘটল এটিও সত্য। বর্তমান যুগেও যে এমন ঘটনা দেখা যায় না, তা নয়।

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

লেখক শরৎচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁর অসামান্য অনুকম্পাভরা জীবনদৃষ্টি। তাঁর রচনা পাঠককে বিপুলভাবে আকর্ষণ করে। খুব বেশি ছোটগল্প তিনি লেখেননি, কিন্তু 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের অন্যতম। 'মহেশ' গল্পটিতে লেখক আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের যে রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। তাই গল্পটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হল।

লেখক-পরিচিতি :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সকালে মতিলাল তাঁকে দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি করে দেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভরতি হন। পরে জুবিলি বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করে জুবিলি কলেজে ভরতি হন। কিন্তু এফ.এ পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পারায় তাঁর পরীক্ষায় বসা হয়নি।

শরৎচন্দ্র জীবনে নানা ধরনের কাজ করেছেন। কখনো এস্টেটের ম্যানেজারের চাকরি, কখনো ইংরেজি তর্জমা করার চাকরি, আবার কখনো বর্মা রেলওয়ের চাকরি। কিন্তু কোনো চাকরিতেই তিনি দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারতেন না।

ভাগলপুরে বন্ধু এবং প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টের বাড়িতে একটি সাহিত্যসভা বসত। সভায় শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল। সেখানেই হাতে লেখা

পত্রিকা ‘ছায়া’তে তাঁর গল্প চর্চার আরম্ভ। এসময় তিনি ‘মন্দির’ নামে একটি গল্প ‘কুন্তলীন প্রতিযোগিতা’য় পাঠিয়ে প্রথম পুরস্কার পান। অবশ্য গল্পটি তিনি সসংকোচে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে পাঠিয়েছিলেন। রেঙ্গুন থেকে ছুটিতে বাড়িতে এলে ‘যমুনা’ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তাঁকে পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে ‘রামের সুমতি’ গল্পটি পাঠিয়ে দেন, যা ‘যমুনা’ পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি ‘ভারতবর্ষ’, ‘বিচিত্রা’ ইত্যাদি পত্রিকার জন্যও লেখা পাঠাতে শুরু করেন।

রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় ফিরে এসে শরৎচন্দ্র পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং লেখালিখিকেই জীবিকা করে তোলেন। তাঁর সাহিত্যজীবন মোটামুটি ১৯১৩ থেকে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে আছে ‘পল্লীসমাজ’, ‘দেবদাস’, ‘দত্তা’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘গৃহদাহ’, ‘পথের দাবী’ ইত্যাদি। ‘রামের সুমতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘মেজদিদি’, ‘বৈকুণ্ঠের উইল’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘মহেশ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’ ইত্যাদি তাঁর বহুচর্চিত কয়েকটি গল্প। ‘দেবদাস’, ‘পরিণীতা’, ‘বড়দিদি’, ‘দত্তা’, ‘বিরাজ বৌ’ ইত্যাদি গল্প-উপন্যাস নিয়ে পরবর্তীকালে বাংলা চলচ্চিত্র (সিনেমা) তৈরি হয়েছে।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি এই মহান সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।

মূলপাঠ :

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টু’ শব্দটি করিতে পারে না— এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথিপূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহরবেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে,

আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে— যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি ঘরে আছিস?

তাহার বছর-দশকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর।

জ্বর। ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড ! ম্লেচ্ছ !

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি? এ হিঁদুর গা, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খর বাক্যই বাহির হইবে। কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমন ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে সে বামুন নয় !

কি কোরব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আনব— তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি— খামারে পড়ে ; খড় এখনো গাদা দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, ছাড়িস ত ঠান্ডায় কোথাও বেঁধে

দিয়ে দু-আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি? ফ্যানে জলে দে না এক গামলা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিই না হয় দাও। চালে খড় নেই— একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু, না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচিনে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস-দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না।— বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই— খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রামরাজত্বে বাস করিস— ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কোরব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই, বল ত? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা— মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল— বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোনা যাচ্ছে,—

দাও না ঠাকুরমশাই কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেটপুরে খেতে দিই,— বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু'পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মরণ, ছুঁয়ে ফেলবি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি— একটি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব— কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধবি কি করে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধবো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না। যেমন করে পারি শুধবো।...

যা যা সর, পথ ছাড়। ঘরে যাই, বেলা হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচকিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়া সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি!

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফল-মূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েছে এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই। নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ! যে শিঙ, কোন্ দিন দেখছি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক গে,—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে

আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে— কিন্তু, তুই ত জানিস, তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি— তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না— লোকে বলে তোকে গো-হাঁটায় বেচে ফেলতে,—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছ রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শীগ্‌গির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার—

বাবা?

কেন মা?

ভাত খাবে এসো, বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল ; লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরানো পচা খড় মা, আপনি ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করছ!

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন ধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, একথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে!

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েছি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এইটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা— জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভালো?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে বড় ক্ষিদে পেয়েছে!

তখন? তখন হয় ত জ্বর ছিল না মা।

তা হলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের বেলা খেয়ো।

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠান্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

দুই

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেছ বাবা, মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি !

হ্যাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বললে, তোর বাপকে বল গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে, বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহু প্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার নাই। বিশেষতঃ মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বললে, তিন দিন হলেই পুলিশের লোকে তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে।

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে কি আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়ের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব, আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়া-গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ

টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙাব না, এই পুরোপুরিই দিলাম,—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলছি—খবরদার বলছি, ভালো হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি। আমার জিনিস আমি বেচব না— আমার খুশি। এই বলিয়া, সে নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে। এই বলিয়া, সে ট্যাক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল।

একটা কলহ বাঁধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দু'টাকা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না!

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চামড়াটাই যা দামে বিকোবে। নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে, তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত' জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল। শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস করি আছিস, জানিস?

গফুর হাত জোড় কহিল, জানি। আমরা খেতে পাইনে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদ্-মেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো কোরবো না কর্তা ! এই বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা—হয়েছে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্য-প্রভাবে ও শাসন-ভয়েই নিবারিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যেজন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

তিন

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ-বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে— আজ এ কথা ভাবিতে যেন ভয় হয়। মনে হয়, সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্তল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই,

সমাপ্তি নাই— সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এমনি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জনমজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয়, এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত ; তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কি বললি— হয়নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা!

চাল নেই? সকালে আমায় বলিস নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম?

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে বলেছিলুম! রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কি করে? রোগা বাপ খাক্ আর না খাক্, বুড়ো মেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিলবি। এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? কত লোকে মরে, তুই মরিস নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সে-ই জানে! তাহার মনে পড়িল,

তাহার স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ তাহার মেয়েকে কৃপা করিবার অবসর পায় নাই— এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল; চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি, কেন?

বাবুমশায় ডাকছেন, আয়!

গফুর কহিল, আমার খাওয়া-দাওয়া হয় নি, পরে যাবো।

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে, অত ক্ষীণ কণ্ঠ অত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না,— না হইলে তাহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টাঘানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে।

তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির

হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়— ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছিল। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয়, বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে— প্রজার মুখের এত বড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোনমতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা-দুটা তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল !

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া

নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘন্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তরে মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তির খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ-সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই-হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াইছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই,— সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আবরু থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল—গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।

শব্দার্থ ও টীকা :

প্রতাপ— তেজ, পরাক্রম। তর্করত্ন— সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ উপাধি হল তর্করত্ন। এখানে তর্করত্ন উপাধি পেয়েছেন এমন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ও জমিদারবাড়ির পুরোহিতের একটা নাম অবশ্যই আছে। কিন্তু উপাধি দিয়েই তিনি গ্রামের লোকের কাছে পরিচিত। বাটি— বাড়ি। ফুটিফাটা— 'ফুটি' একপ্রকারের ফল। এই ফল বেশি পেকে গেলে উপরের খোসার দিকটা ফেটে যায়। অনাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড খরার জন্য মাটির রস (জল) শুকিয়ে এর উপরিভাগে অসংখ্য ফাটল দেখা দেয়। খরা-বিধ্বস্ত গ্রামের অবস্থাটিকে ফুটিফাটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাঙ্গণ— উঠোন। জোলা— ফার্সি ভাষার 'জুলাহ' শব্দ থেকে বাংলায় জোলা শব্দটি এসেছে ; মুসলমান তন্তুবায় অর্থাৎ তাঁতিদের জোলা বলা হয়। তবে এই গল্পে গফুর যে তাঁতে কাপড়-গামছা প্রভৃতি বোনে এমন কোনো প্রমাণ নেই ; গফুর চাষবাসের কাজই করে, হয়তো তার পূর্বপুরুষ জোলার কাজ করত বলে গল্পে তাকে জোলা বলা হয়েছে। লাচারে— নিরুপায় অবস্থায়, অসুবিধায়। বিচুলি— ঝেড়ে-নেওয়া ধানের শুকনো গাছ। খামার— শস্য মাড়াই করার স্থান। দুর্বচ্ছর— দুঃসময়। আট সন— আটটি বছর। কসাই— প্রাণী হত্যা করে তার মাংস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহকারী। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যক্তি। সানকি— থালার মতো একধরনের পাত্র। খোঁয়াড়— গৃহপালিত জন্তুদের (গরু, ছাগল ইত্যাদি) আটক করে রাখবার স্থান। তোবা— আরবি ভাষার 'তৌবহ' শব্দ থেকে জাত; মুসলমানদের অনুতাপসূচক শব্দ এবং ভবিষ্যতে অন্যায় না করার প্রতিজ্ঞা। অবিদিত— অজানা। আত্মবিস্মৃত— নিজের পরিচয় ভুলে যাওয়া। ইজ্জত— সম্মান। খিড়কীর পুকুরে— বাড়ির পিছনের দরজার কাছে বা বাইরে যে পুকুর। কসুর— ত্রুটি, অপরাধ।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) 'মহেশ' গল্পটির লেখক কে?

(খ) গফুরের গ্রামের নাম কী?

(গ) কাশীপুর গ্রামের জমিদারের নাম কী ছিল?

(ঘ) 'সব পেটায় নমঃ' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

(ঙ) "পাঁচ সাতদিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল"— গফুরের চিন্তার কারণ কী ছিল?

(চ) গফুরের মেয়ের নাম কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) "মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস,"— উক্তিটি কার? মহেশ কীভাবে তাদের আট সন প্রতিপালন করেছে?

(খ) "পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল,"— এখানে পিতা ও কন্যা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? ছলনাটি কী?

(গ) "প্রজার মুখের এত বড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোনমতেই সহ্য করিতে পারেন নাই।"— প্রজাটি কে? তার কোন স্পর্ধার কথা এখানে বলা হয়েছে?

(ঘ) "কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়।"— কে কার প্রতি এই উক্তি করেছে? অনুরোধটি বিবৃত করো।

(ঙ) "প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার নাই,"— কার কীরূপ শাস্তির কথা এখানে বলা হয়েছে?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) "যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই"— বক্তা কে? প্রসঙ্গটি বিবৃত করো।

(খ) "তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না।"—কে কাকে একথা বলেছে? উক্তিটির অর্থ পরিস্ফুট করো।

(গ) "ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"— এখানে মা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? 'ওসব থাক' বলতে কী সবের কথা বলা হয়েছে? "মহেশের প্রাচিত্তির" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(ঘ) 'মহেশ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

(ঙ) মহেশ গল্প-অবলম্বনে গফুরের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

(চ) 'মহেশ' গল্পের জমিদার ও তর্করত্নের চরিত্র আলোচনা করে সামাজিক শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় অবিচারের ছবিটি পরিস্ফুট করো।

(ছ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো :

(i) যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।

(ii) কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ।

পাঠবোধ :

সমাজভাবনা, অপত্য স্নেহ এবং গভীর অনুভূতি তিনটি বিষয়েরই প্রাধান্য রয়েছে 'মহেশ' ছোট গল্পটিতে।

সমাজ চিত্রটি তৎকালীন। কিন্তু অপত্য স্নেহের চিত্রটি বিশ্বজনীন, সর্বকালীন। গফুর মিঞার চাষের বলদ 'মহেশ'। গফুর মহেশকে শতকষ্টের দিনেও গো-হাটায় বিক্রি করেনি কিংবা কসাইয়ের হাতে পয়সার লোভে তুলে দেয়নি।

এই 'মহেশ'-কে উপলক্ষ করেই লেখক একাধারে তৎকালীন গ্রাম বাংলার সমাজপতিদের ও ধনী জমিদার শ্রেণির স্বৈরাচারী নির্যাতন ও শোষণের নিষ্ঠুরতা, তাদের স্তাবকদের চাটুকারিতা এবং নির্যাতিত মানুষের করুণ অসহায়তার কথা জীবন্ত ভাষাচিত্রে অঙ্কন করেছেন। বর্ণ, ধর্ম, কর্ম থেকেও বড়ো হয়ে উঠেছে নির্যাতিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিসিক্ত লেখকের মন। সাহিত্যিকের সমাজচিন্তার এক অতি বিশ্বস্ত ফসল 'মহেশ' গল্পটি।

আহার ও পানীয়
(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

স্বামী বিবেকানন্দ

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর স্বামী বিবেকানন্দের মনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তুলনামূলক ভাবনা জাগে। সেই ভাবনারই ফসল তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থটি। 'আহার ও পানীয়' অংশটি বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক। উপরন্তু বিবেকানন্দের গদ্যশৈলীর সঙ্গে পরিচয় করানো উদ্দেশ্যে রচনাটি পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি :

কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত এবং মা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী। শৈশবে তাঁর নাম ছিল বীরেশ্বর। ছোটোবেলায় প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসু আর মেধাবী ছিলেন বীরেশ্বর। কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমানের স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে এফ.এ আর ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। আইন পড়ার সময় পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন দেখা দিলে তিনি পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন ও কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন। এফ.এ পড়ার সময় রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে মানব-সেবার দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গুরুভ্রাতাদের নিয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপন করেন।

পরের বছর তিনি পরিব্রাজকরূপে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে শিষ্যদের আগ্রহে এবং সারদাদেবীর অনুমতি নিয়ে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যান। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সেই মহাসভায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভারতের যে একটি সুপ্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, মানবতাবোধে উজ্জ্বল একটি ভাবমূর্তি আছে, তা তিনি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন। বিবেকানন্দের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে যারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিস মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা)। বিবেকানন্দ আধুনিক যুগে হিন্দু ধর্ম সাধনার অন্যতম প্রতীক। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন এবং ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশনের কেন্দ্র হিসাবে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্ত ও রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি বাংলাভাষায় ‘উদ্বোধন’ আর ইংরেজিতে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর বহু লেখা ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ তেমনই একটি গ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদির মধ্যে আছে ‘পরিব্রাজক’, ‘ভাববার কথা’, ‘বর্তমান ভারত’, ‘কর্মযোগ’, ‘রাজযোগ’ ইত্যাদি। তাঁর মৃত্যুর পর সংকলিত ‘পত্রাবলী’ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা গদ্যভাষা রচনায় তাঁর অসামান্য দখল ছিল এবং বাংলা গদ্যের তিনি অন্যতম রূপকার।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই এই মহামানবের দেহাবসান ঘটে।

মূলপাঠ :

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্মসম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্যের মতে ‘আহার’ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়জ্ঞান আর রামানুজাচার্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই

ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয়সকল যথাযথ কার্য কি করেই বা করে? কদর্য আহারে ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণশক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্যয় হয়, এ-কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণ দোষে এক জিনিসকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোন বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব ; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে আধারটা নিয়েই টানা-হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনিটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত ; যেমন প্যাঁজ লশুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে ; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই করতে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ— ‘ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না’। তবে অনেক স্থলেই ‘উলটা সঁমঝ্‌লি রাম’ হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্‌গুরুদের জীবনী পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্নভোজন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মতো শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নেই। সমস্ত ভূমণ্ডলে আমাদের দেশের মতো পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোন দেশ নেই। নিমিত্তদোষ সম্বন্ধে বর্তমানকালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা দাঁড়িয়েছে ; ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র দেখতেই পাচ্ছ, কিরূপ নিমিত্তদোষে দুষ্ট ময়লা আবর্জনা পচা পক্কর সব ওতে আছেন— এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ঐ ময়রার দোকানে— বাজারে খাওয়ার ফল। এই যে প্রস্রাবের ব্যারামের প্রকোপ, ও-ও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকের তত অজীর্ণদোষ, প্রস্রাবের

ব্যারাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি 'বিষলড্ডুক'-এর অভাব। এ-কথা বিস্তার করে পরে বলছি।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীনকালে চলেছে এবং আধুনিককালে চলছে। প্রথম—প্রাচীনকাল হতে আধুনিককাল পর্যন্ত এক মহা বিবাদ—আমিষ আর নিরামিষ। মাংস-ভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। এক পক্ষ বলছেন— কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয় ; আর এক পক্ষ বলছেন— রাখো তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতর মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বলছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর ; আবার বলছেন, জীবঘাত ক'রো না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত করছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে-সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ— যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে-সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়, মনু বলছেন। অপর দিকে জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক, যে যজ্ঞ করবে বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তকে সাজা দিচ্ছেন।

আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন। বর্তমান কালে শাস্ত্রও শুনবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত রোগে লোপাট হয়ে যেত এত দিনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই ; অপর পক্ষ বলছেন

হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম করতে পারে ; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হত ; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখ, আর জাপানীরাও ঐ ছিল ; মাংসাহার আরম্ভ ক'রে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড় লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে মাংসাহারে বদহজম, আর এক পক্ষ বলেছেন— সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠশুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায় তা, বলে কি দুনিয়াসুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলেছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্যসমাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক ; আর পক্ষ বলছেন, একান্ত অন্যায়। এই তো বাদ-বিবাদ চলছে।

সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে, জন্ম-কর্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ-ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি। যতদিন মনুষ্য-সমাজে এই ভাব থাকবে— 'বলবানের জয়', ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার করতে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না— জাতি জাতির তুলনা ক'রে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে কোঁদল। এক পক্ষ বলছেন যে,

ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও-সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক [starchy] খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরুকে পর্যন্ত ঘরে ব'সে চাল গম খাওয়ালে রোগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতা প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম। বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু, গম ইত্যাদি খায় না ; যদি খায় তো অপক্ক অবস্থায় যখন স্টার্চ [starch] অধিক হয়নি। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চলছে। এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ— এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেক দিন পর্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড়-গোড়ে জং ধরতে দেয় না।

এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া, খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে ; যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু, গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?

ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নেই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙলাদেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙালী কবি লুচি-কচুরির বর্ণনা করেছেন? ও লুচি-কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালে-ভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি 'পাকি রসুই' খেয়ে থাকে এমন লোক তো দেখিনি! মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লাড্ডুকপ্রিয় ; দু-চার বৎসরেই চোবের হজমের সর্বনাশ হয়, আর চোবেজী চুরন খেয়ে খেয়ে মরেন।

গরিবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারের খাদ্যদ্রব্যে কিছুই নেই, একদম উল্টো আছেন বিষ— বিষ— বিষ। পূর্বে লোকে কালে-ভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত ; এখন শহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা শহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে

অজীর্ণরোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র ! খিদে পেলেও কচুরি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও— সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণীদের মতো খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলমাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও ; তবে ও পশ্চিমি নানাপ্রকার গরম মসলাগুলো বাদ দিয়ে। মসলাগুলো খাওয়া নয়— এগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাইশুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদু ; প্যারিস রাজধানীর ঐ সূপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইশুঁটি খুব সিদ্ধ ক'রে, তারপর তাকে পিযে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধছাঁকনির মতো তাদের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ ধনে জিরে মরিচ লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও— উত্তম সুস্বাদু সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে তো উপাদেয় হয়।

ঐ যে কত প্রস্রাবের রোগের ধূম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দু-চার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদহজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হল? যেটুকু হজম হবে, সেটুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদহজম। পায়ের মাংস লোহার মতো শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন [albumen] দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে বসো না। ও-সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ায় দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পারো ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই ক'রে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ— 'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্'। পারতপক্ষে ওযুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওযুধে মরে পনের আনা। পারো যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন (ধনী) হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া— দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো

হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খাম্বীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোন খাম্বীরদার জিনিস খাবে না, এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্বপ্রকার খাম্বীরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে-কোন জিনিস মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম 'সুক্ত'; তা খেতে নিষেধ— কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়— উত্তম জিনিস। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয় তো তাকে পুনর্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও।

অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জলশুদ্ধির বড়ই ধূম। এখন ঐ যে ফিলটার ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিলটার জলকে ছেঁকে নেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠা প্লেগের বীজ তা যেমন তেমনি থাকে ; অধিকন্তু ফিলটারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিলটার করা জল হল তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠা হয় নাই ; তারপর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিলটার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠা বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিলটারের মধ্যে দিশি তেকাঠার ওপর ঐ যে তিন-কলসীর ফিলটার উনিই উত্তম, তবে দু-তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফটকিরি দেওয়া— গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফটকিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফটকিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফটকিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিলটার-মিলটারের চোদ্দপুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপান্ত করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় হয় বটে। ফটকিরি-থিতান জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিলটার-মিলটার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই

বাষ্পকে জল করে। তারপর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পুরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায় (তার পরিবর্তে)। সে জল অতি বিশুদ্ধ ; ঘরে ঘরে এখন দেখছি তাই।

যার দু-পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা-মেঠাই খাওয়াবে !! ভাত রুটি খাওয়া অপমান !! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়েভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি? এত বড় মণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাই-মণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান দেশে বাস দিনরাত কসরত ! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই— ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা !! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দু-কুড়ি কই মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে ; 'কলকেত্তা'ই হওয়ার এই ফল !! আর সর্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার-বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব করতে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে তো অমনি একটু ওষুধ দাও ; পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর্ ওষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আস্‌গে যা। নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি সুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশি কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, এই আপসোস। খাবার নকল কি ইংরেজের করতে হবে — সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পারো। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক মাত্র— আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকড়োয় দাঁড়াবে !! তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাত-মাটি দেওয়া ময়রার দোকানরূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও টাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য'

হচ্ছে !! নিজেরা তো উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশসুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, শহুরে লোক ! তোমাদের মুখে ছাই ! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর মর হবে, তবু বলবে না যে, এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে— নোনা লেগেছে !! কোন রকম করে শহুরে হবে !!

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তো এই মোট কথা শুনলে। এখন পাশ্চাত্যরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

গরিব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই ধান্যবিশেষ ; এবং শাক তরকারি মাছ-মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাটনির মতো ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরিবের প্রধান খাওয়া তাই ; অন্যান্য জিনিস আনুষঙ্গিক। যেমন বাঙলা ও উড়িষ্যায়, মাদ্রাজ উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য ; তার সঙ্গে ডাল তরকারি, কখন কখন মাছ-মাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত ; সাধারণ লোকের নানাপ্রকার বজরা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা প্রভৃতি ধান্যের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক, তরকারি, ডাল, মাছ, মাংস, সমস্তেরই— সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ করবার জন্য ব্যবহার, তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরা— এমন কি রাজারাও— যদিও নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করেন, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধ সের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিত খায়।

পাশ্চাত্যদেশে এখন যে সকল গরিব দেশ আছে (তাদের) এবং ধনী দেশের গরিবদের মধ্যে ঐ প্রকার রুটি এবং আলুই প্রধান খাদ্য ; মাংসের চাটনি মাত্র— তাও কালেভদ্রে। স্পেন, পোর্তুগাল, ইতালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষাওয়াইন অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নেই (অর্থাৎ পিপে-খানেক না খেলে তো আর নেশা হবে না এবং তা কেউ খেতেও পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ-মাংসের জায়গায় ঐ দ্রাক্ষারস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল— যেমন রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি

দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধান্যের রুটি ও এক-টুক্‌রা শুঁটকী মাছ ও আলু।

ইওরোপের অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবাল-বৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম— অর্থাৎ রুটি ভাত প্রভৃতি চাটনি এবং মাছ-মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি খাওয়া নেই বললেই হয়। মাছ মাছই এল, মাংস মাংসই এল, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য প্রত্যেক বারেই থালা বদলানো হয়। যদি দশটা খাবার জিনিস থাকে তো দশবার থালা বদলাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্তো এল, তারপর থালা বদলে শুধু ডাল এল, আবার থালা বদলে শুধু ঝোল এল, আবার থালা বদলে দুটি ভাত, নয়তো দুখানা লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিস অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না।

ফরাসী চাল— সকালবেলা 'কফি' এবং এক-আধ টুকরো রুটি-মাখন; দুপরবেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ, রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম ; জার্মানরা ক্রমাগতই খাচ্ছে— পাঁচ বার, ছ-বার, প্রত্যেক বারেই অল্পবিস্তর মাংস। ইংরেজরা তিনবার— সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি-যোগ আছে। আমেরিকানদের তিনবার—উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর।

তবে এ সকল দেশেই ডিনারটা প্রধান খাদ্য— ধনী হলে তার ফরাসী রাঁধুনি এবং ফরাসী চাল। প্রথমে একটু আধটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোন চাটনি বা সবজি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি। তারপর সুপ, তারপর আজকাল ফ্যাশন— একটা ফল, তারপর মাছ, তারপর মাংসের একটা তরকারি, তারপর থান-মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সবজি ; তারপর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষ্যাদি, তারপর মিষ্টান্ন, শেষ কুলপি—'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদলাচ্ছে— শেরি, ক্ল্যারেট, শ্যামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুলপি একটু আধটু। থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ সব বদলাচ্ছে ; আহারান্তে 'কফি'—বিনা-দুগ্ধ, আসবমদ্য— খুদে খুদে গ্লাসে, এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পারলে তবে 'বড়োমানুষি চাল' বলবে। একটা খাওয়ায়

আমাদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্বস্বান্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধূম এরা করে।

আর্যরা একটা পিঠে বসত একটা পিঠে ঠেসান দিত এবং জলচৌকির ওপর থালা রেখে এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল এখনও পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙালী, উড়ে, তেলিঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই 'সাপড়ান'। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙট পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্মি, জাপানী প্রভৃতি উবু হয়ে বসে কাটি ও চামচ-যোগে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইওরোপীরা টেবিলের ওপর হ'তে কেদারায় ব'সে— হাত দিয়ে পূর্বে খেত, এখন নানাপ্রকার কাঁটা-চামচ।

চীনের খাওয়াটা কসরত বটে— যেমন আমাদের পানওয়ালীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে আঙুল আর মুঠোর কায়দায় চিমটের মতো করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে, একবাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্মিত খোন্তাযোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত ; পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠল, চাষ বাস শিখলে ; আরণ্য পশুকুলের মতো একদিন বেদম খাওয়া আর দু-পাঁচ দিন অনশন— ঘুচল ; আহার নিত্য জুটতে লাগল ; কিন্তু পচা জিনিস খাবার চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাটনি হয়ে দাঁড়াল।

এস্কুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে দেশে একদম জন্মায় না; নিত্য ভোজন— মাছ মাংস ; ১০/৫ দিনে অরুচি বোধ হ'লে একটুকরো পচা মাংস খায়— অরুচি সারে।

ইওরোপীরা এখনও বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙিয়ে রাখে— যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধ হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না ; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়।

পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া ক'রে ধ'রে মুখে পুরবে— তা নাকি বড়ই সুস্বাদ !! নিরামিষাশী হয়েও প্যাঁজ-লশুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে, দক্ষিণী বামুনের প্যাঁজ-লশুন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। প্যাঁজ, লশুন, গেঁয়ো শোর, গেঁয়ো মুরগী খাওয়া এক জাতের (পক্ষে) পাপ, সাজা— জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা তারা ভয়ে প্যাঁজ-লশুন ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিং খেতে আরম্ভ করলে। পাহাড়ী গোঁড়া হিঁদু লশুনে-ঘাস প্যাঁজ-লশুনের জায়গায় ধরলে। ও-দুটোর নিষেধ তো আর পুঁথিতে নেই।

সকল ধর্মেই খাওয়া-দাওয়ার একটা বিধি-নিষেধ আছে ; নেই কেবল ক্রিশ্চানী ধর্মে। জৈন-বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মূলো প্রভৃতি— তাও খাবে না। খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে, রাত্রে খাবে না— অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

ইহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোন জিনিস যদি হেঁশেলে ঢোকে যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, তা সব ফেলে দিতে হবে। এ বিধায় গোঁড়া ইহুদী অন্য কোনও জাতির রান্না খায় না। আবার হিঁদুর মতো ইহুদীরা বৃথা-মাংস খায় না। যেমন বাংলাদেশে ও পাঞ্জাবে মাংসের নাম 'মহাপ্রসাদ'। ইহুদীরা সেই প্রকার 'মহাপ্রসাদ', অর্থাৎ যথানিয়মে বলিদান না হলে মাংস খায় না। কাজেই হিঁদুর মতো ইহুদীদেরও যে-সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নেই। মুসলমানরা ইহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না ; দুধ, মাছ, মাংস একসঙ্গে খায় না এইমাত্র, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই যে সর্বনাশ, অত মানে না। ইহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য— খাওয়া সম্বন্ধে ; তবে ইহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পাঞ্জাবে মুসলমান-হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায় বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া একটা ধর্মবিশেষ। দক্ষিণ-দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের মধ্যে গেঁয়ো শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগী খায়, গেঁয়ো খায় না। বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয়— এক রকম চালে চলে। মনুক্ত খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলে সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্যন্ত— বাঙালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইনের বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙালী মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই ; কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

এলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে— যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নেই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাজেই নিষেধ ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখতে যায় বল। তা ছাড়া রোগ— বুনো জানোয়ারের কম !

দুধ-পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ— যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরি লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিস, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ ইহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুখ খাওয়ায়, আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে !! এখানকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কদের জন্যও এক পোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন; কচি ছেলেদের জন্য 'ফিডিং বট্‌ল্‌' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মা ব্যস্ত কাজে— দাসী একটা ঝিনুকে করে ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুখ খাওয়াচ্ছে !! লাভের মধ্যে এই যে, রোগাপটকাগুলো আর বড় 'বড়' হচ্ছে না, তারা ঐখানেই জন্মের শোধ দুধ খাচ্ছে ; আর যেগুলো এ বিষম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠুলে উঠছে, সেগুলো প্রায় সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ।

সেকেলে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ানো প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলেগুলো বেঁচে উঠত, সেগুলো এক রকম সুস্থ সবল আজীবন থাকত ! মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেলে বাঁচত !! সে তাপসেঁক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত— উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিল্লুঠের তুলসীতলার

খোকা ও মা— দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকের হাত এড়াত বলে।

শব্দার্থ ও টীকা :

অন্ন— ভাত। বিষলড্ডুক— বিষের লাড্ডু। মাংসাশী— যাঁরা মাংস বা আমিষ আহার করেন। হিঁদু— হিন্দু। অজীর্ণ— হজম না হওয়া। কুড়ের বাদশা— একটি বাংলা প্রবচন (অত্যন্ত অলস ব্যক্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য) ফটকিরি-থিতান— ফিটকিরি দেওয়া। খাম্বীর— খাদ্যকে সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু করার জন্য কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফল পচিয়ে তৈরি করা একরকম রস। সাপড়ান— উপভোগ করে খাওয়া। আঙট— গোটা কলাপাতা বা তার অগ্রভাগ। শঙ্করাচার্য— (৭৮৮-৮২০ খ্রিঃ) সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের মালাবার অঞ্চলে আবির্ভাব। শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বীরা তাঁকে শিবের অবতার বলে মনে করেন। রামানুজ— দাক্ষিণাত্যের চোল গ্রামে রামানুজাচার্যের আবির্ভাব খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে। ইনি একজন বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রচারক। চৈতন্যদেব— বৈষ্ণব মহাপুরুষ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। মনু— প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'মনুসংহিতা'-প্রণেতা। দ্বিশফ— দ্বিখণ্ডিত ক্ষুর-বিশিষ্ট প্রাণী। বৃথা-মাংস— যে মাংস দেবতার উদ্দেশে বলিপ্রদত্ত নয়।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নাম কী ছিল?

(খ) শঙ্করাচার্য কে ছিলেন?

(গ) কারা বুনো হাঁসের ডিম খেতে ভালোবাসে?

(ঘ) 'আহার ও পানীয়' রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে?

(ঙ) বাংলাদেশে ও পাঞ্জাবে মাংসকে কী বলা হয়?

(চ) রাজপুতদের ধর্মীয় খাদ্য কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) আচার্য রামানুজ ভোজ্যদ্রব্য বিষয়ে কোন তিনটি দোষ সম্পর্কে সাবধান করেছেন?

(খ) ভারতে এবং বিদেশে গরিবের আহার কী?

(গ) দুধ খাওয়ার নিয়ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ কী বলেছেন?

(ঘ) "ইহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য-খাওয়া সম্বন্ধে;"— বিবেকানন্দের অনুসরণে উভয়ের খাওয়ার সাদৃশ্য সম্বন্ধে লেখো।

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) "আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়,"— বিবেকানন্দের অনুসরণে মন্তব্যটির গুরুত্ব আলোচনা করো।

(খ) "জাতিদুষ্ট অন্নভোজন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মতো শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নেই।"—লেখকের অনুসরণে আলোচনা করো।

(গ) বর্তমান যুগে আহার সম্পর্কে সর্বসাধারণের মত কী?

(ঘ) হিন্দুদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতামত তুলে ধরো।

(ঙ) "অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ।" লেখকের অনুসরণে এই উক্তির ব্যাখ্যা করো।

(চ) "আহার ও পানীয়" রচনাটিতে স্বামীজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খাদ্যাভ্যাসের যে তুলনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

পাঠবোধ :

পাশ্চাত্য ভ্রমণের ফলে বিবেকানন্দ বহুজাতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাক, রীতি-নীতি ইত্যাদি দেখেছেন এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটিতে। এই মূল্যবান গ্রন্থটি একটি কোষগ্রন্থের কাজ করে।

প্রাচীন কামরূপের শাসননীতি

রাজমোহন নাথ

লেখক পরিচিতি :

ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অসমের বরাক উপত্যকা যে কয়জন ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে, তাঁদেরই একজন রাজমোহন নাথ। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর (মতান্তরে ১৯০০ সাল) হাইলাকান্দি শহরের অদূরবর্তী রাঙ্গাউটি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা গোবিন্দচন্দ্র নাথ ও মাতা গৌরীদেবী। এঁদের তৃতীয় সন্তান রাজমোহন স্বকীয় প্রচেষ্টা, আগ্রহ ও মেধার দ্বারা সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বরাক উপত্যকার এক সুসন্তান হিসাবে।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে (বিজ্ঞান শাখা) ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক হন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয় অসমের নগাঁও শহরে পিডব্লুডি বিভাগে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে। অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে সুনামের সঙ্গে কাজ করে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাজমোহন নাথের অধ্যয়নের ক্ষেত্র একাধিক। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়াও প্রত্নতত্ত্ব, নাথতত্ত্ব ও দর্শন, শঙ্করদেব, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এবং তিনি বিষয়গুলো নিয়ে নানা নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা এবং সম্পাদনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে 'Antiquities of the Kapili and Jamuna Valleys' (১৯৩৭), 'Kandali and Kadali Kingdom' (১৯৩৯), "Nath's Handbook for Civil Engineers' (১৯৪২), 'শ্রীশ্রীশঙ্কৰদেবৰ বৰগীত', (অসমিয়া ১৯৪৩), 'সোনাধনের গীত' (১৯৪৭), 'The Background of Assamese Culture' (১৯৪৮), 'নাথযোগী তত্ত্ব' (১৯৫৮) ইত্যাদি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা,

যোগীসখা, শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অসম সাহিত্য সভা পত্রিকা, আবাহন, Journal of the Assam Research Society ইত্যাদি পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। কামরূপ সঞ্জীবনী সভা থেকে ‘তত্ত্বভূষণ’, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ‘সিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভাস্কর’, অখিল ভারতীয় নাথ সমাজ থেকে ‘নাথতত্ত্বরত্ন’ ইত্যাদি উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল তিনি শিলঙে প্রয়াত হন।

প্রবন্ধটি প্রথমে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উষারঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকা’ গ্রন্থে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সেখান থেকে সংক্ষেপিত আকারে প্রবন্ধটি এখানে সংকলিত।

মূলপাঠ

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন কামরূপের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানব কৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়—তাহার সর্ব্বপ্রথম পরিস্ফুরণ হইয়াছিল— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে সময় ভারতবর্ষের আদিমানব প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বৎসর খৃষ্ট পূর্ব্বে পশ্চিমপ্রান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া শিকারলব্ধ মাংস ও বন্য কন্দমূল এবং মৎস্য আহার করিয়া দিন কাটাইত প্রায় সেই সময়েই ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অষ্ট্রীক জাতি বর্ত্তমান আসামের উপত্যকা ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে। তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে ধান, পান কলা, কচু, হলুদ, সুপারি ও নারিকলের চাষ আরম্ভ করে ; পাহাড়ের গা কাটিয়া জল বাঁধিয়া ধানের ক্ষেত করে।

জার্ম্মেণ পণ্ডিত স্মিটের মতে— এই জাতীয় মানুষ বর্তমান ইন্দোচীনের উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়া প্রাচীন কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিল; ইহাদেরই এক শাখা দক্ষিণ বর্ম্মা ও শ্যামের মোন্ বা তালৈং জাতি এবং কাম্বোজের খ্‌মের জাতি; আসামের খাসিয়ারা সেই জাতির খাঁটি নির্দর্শন। এই জাতির স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত প্‌শিলুস্কি অনুমান করেন— ইহারা ছিল,— পীতাভ, কতকটা মঙ্গোল জাতির মত চেহারা ;

সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, ভাবুক ও কল্পনাশীল, প্রফুল্লচিত্ত, কবিত্বগুণযুক্ত, দায়িত্বহীন, সংহতিশক্তিহীন, কিন্তু অন্যের নিকট লাঘব স্বীকার করিতে নারাজ।— এই বিবরণের সহিত পুরাণোক্ত, "কর্কশকায়, সুবর্ণস্তম্ভনিভ, জ্ঞানহীন, বিনাকারণে মুণ্ডিতমস্তক কিরাত জাতির সম্পূর্ণ মিল আছে। এই কিরাতদের বাসভূমি কামরূপেই ছিল।

অষ্ট্রীকরা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত, এবং মনে করিত মৃত্যুর পর আত্মা গাছে, পাহাড়ে, প্রস্তরে বা অন্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত ; এবং সেই আত্মার উদ্দেশ্যে তাহারা মধ্যে মধ্যে আহারাদি দিত। গৌহাটীর সন্নিকটস্থ নীলাচল পর্বতে কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান। হিন্দুদের বিশ্বাস এই স্থানে মৃত সতীর খণ্ডিত দেহাংশ পতিত হইয়াছিল,— কিন্তু অষ্ট্রীক ভাষায় কামাখী বা কামাক্ষী শব্দের অর্থে মৃতের উদ্দেশ্যে পূজা করার স্থান। পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন— মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান,— দুর্ব্বা, অক্ষত, অন্ন, পায়সাদি দ্বারা দেবতার পূজা— অষ্ট্রীক সভ্যতার দান।

পরবর্ত্তীকালে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া দ্রাবিঢ়, আর্য, অসুর, অলপাইন প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অষ্ট্রীক সভ্যতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ;— কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে ভারতের আদি সভ্যতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল ; এবং প্রাগজ্যোতিপুরের সেই আদি সভ্যতা পশ্চাদাগত সভ্যতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াও আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আছে।

বৈদিক আর্য্যেরা সদানীরা পার হইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন নাই, কিন্তু মাথব রাজা অগ্নিমুখে করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া মিথিলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মিথিলাদেশের এক রাজার গৃহে অসুর বংশীয়— পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ শিশু রাজার অনুগ্রহে রাজপুত্রদের সহিত লালিত পালিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের অসীম সাহসিকতা ও বুদ্ধির প্রখরতা রাজা ও রাণীর মনে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে অনুভব করিয়া যুবক একদিন গোপনে কয়েকটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া আসে এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুরের কিরাতরাজ ঘটকের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিরাতরাজ চতুরঙ্গ সেনা সহ নরকের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু সংহতি শক্তিহীন কিরাতরা যুদ্ধে পরাজিত হয় ; কতক নরকের বশ্যতা স্বীকার করে, কতক

লাঘব স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া দেশান্তরে পূর্ব্বদিকে সাগরের পারে পলায়ন করে;— কামরূপে মিথিলার কৃষ্টির মধ্যে শিক্ষা প্রাপ্ত নরকের একাধিপত্য স্থাপিত হইল।

প্রাচীনকালের রাজারা কোন দৈবশক্তি হইতে নিজের বংশের উৎপত্তি কল্পনা করিতেন।

নরকের শাসন সম্বন্ধে পুরণাদি হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে বুঝা যায় নরক রাজা হইয়া নিজের ধর্ম্ম-পিতা জনককে নিজ রাজ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন, এবং মিথিলা হইতে নানারূপ কর্মচারী আনয়ন করিয়া সেই দেশেরই অনুকরণে দেশের শাসন পরিচালনা করেন। শস্য, পশু, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি-পূর্ণ নগরে নরকের সচিব, দ্বারী, দ্বারাধিপতি, সেনাপতি ও সৈনিক ছিল। নরক দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভনগরে খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতীয় কন্যা বিবাহ করেন। এবং পরে ক্রমশঃ স্বজাতীয় প্রীতিবশতঃ পূর্ব্বতন মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে প্রধান প্রধান কাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে থাকেন।— এই খবর শুনিয়া ভারতের নানা স্থান হইতে অসুর বংশীয় লোকেরা নরকের রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল; রাজানুগ্রহভোগী মৈথিলী পুরুষ ও নারী অসুরদের বিরুদ্ধে নানারূপ আন্দোলন করিতে থাকে ; নরক অসংখ্য ভদ্রপরিবারের নারীকে কারারুদ্ধ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল ; আর্য্য ও অসুরের বিরোধ ; পরিণামে নরকের পতন হইল। নরকের পুত্র ভগদত্ত পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য ও যুদ্ধ সম্ভারসহ পিতৃশত্রুর বিপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতিকায় যখন গুপ্ত সম্রাটদের অভ্যুত্থানে ভারতে হিন্দুরাজ্য সংগঠন ও হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইতেছিল, তখন আবার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে পুষ্যবর্ম্মা নামক এক রাজার অভ্যুত্থান হয় ; তিনি নিজেকে নরক বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন ; প্রগতিশীল গুপ্ত সম্রাটদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশের সংস্কৃতি ভারতের পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃতির সহিত একই গতিতে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছিলেন। সমুদ্রবর্ম্মার রাজসূয়যজ্ঞে কামরূপ-রাজ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; কামরূপ-রাজ মহেন্দ্র

বর্ম্মা আনুমানিক ৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বর্ম্মাবংশের পর শালস্তম্ভবংশ কামরূপের অধীশ্বর হন ; ইহারাও নিজেকে নরকের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন,— ভূমি ও বরাহের সংযোগ হইতে উদ্ভূত বলিয়া নিজেকে পরম বারাহ বলিতেন ;— কিন্তু পূর্ব্বতন বংশীয়েরা তাহাদিগকে রাজ্যাপহারী ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিতেন। শালস্তম্ভ বংশের শেষ রাজা ত্যাগ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাদের, পূর্বতন নরকবংশীয় ব্রহ্মপালকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রহ্মপালের বংশ ভৌম পাল বলিয়া পরিচিত এবং খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতিকা পর্যন্ত এই বংশ কামরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল রাজাদের যে সকল তাম্রলিপি ও প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের স্থানে স্থানে যে সব অসংখ্য প্রস্তর নির্মিত হর্ম্ম্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়— প্রাচীন কামরূপের রাজারা তদানীন্তন ভারতের কৃষ্টির সহিত সমসূত্রে ধাবমান হইতেন।

রাজা— রাজাপদ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীসূত্রে জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু রাজগুণে বিভূষিত ও প্রজার মনোরঞ্জনে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত না হইলে এই নীতির ব্যতিক্রমও হইত। শালস্তম্ভ বংশীয় বলবর্ম্মার চক্র ও অরথি নামক দুই পুত্র বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন ; তাহারা গুরুবাক্য অবহেলনে পটু হওয়াতে কনিষ্ঠ অরথির পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করা হইয়াছিল।

সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্করবর্ম্মাই রাজা হইয়া ছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে তদ্বংশীয় অবন্তীবর্মা সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তখনই রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া নতুন শালস্তম্ভ বংশ রাজ সিংহাসন অধিকার করেন। শালস্তম্ভ বংশের শেষ রাজা ত্যাগসিংহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ পূর্ব্বতন বংশের ব্রহ্মপালকে রাজাপদে বরণ করে।

রাজার উপাধি পরমবারাহ— পরম মাহেশ্বর— পরম ভট্টারক— পরম দৈবত— পরম ভাগবত, মহারাজাধিরাজ। রাজাই সর্ব বিষয়ে সর্বে সর্বা

ছিলেন; রাজাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইত ; কিন্তু গুরুতর বিষয়ে রাজকার্য আধুনিকতম প্রজাতান্ত্রিক নিয়মানুসারে নির্বাহিত হইত। দৈবকার্য্যে বা গুণ গরিমার পুরস্কার স্বরূপ ভূমিদান ব্যাপারেও রাজ্যের রাজকর্মচারীদের মতামত গ্রহণ করিয়া আধুনিক শাসন-নীতির ন্যায় বিভাগ হইতে বিভাগান্তরের ভিতর দিয়া দানপত্র প্রদান করা হইত।

বিষয়— রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত সুবিধার জন্য বৃহৎ কামরূপ রাজ্যকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল ; অংশ বিশেষের নাম ছিল বিষয়। চন্দ্রপুরী বিষয়, কলঙ্গা বিষয়, পারুজি বিষয়, গাল্লিটিপ্যাক বিষয় প্রভৃতিতে বিষয় পতি, বিষয় নায়ক, বিষয়ামাত্য শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

মণ্ডল— মণ্ডলের অধিপতি মাণ্ডলিক। মণ্ডল সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত পারিপার্শ্বিক কতকগুলি রাজ্য লইয়া একটি মণ্ডল ধরা হয় ;— এই সম্পর্কে বিষয়ে যিনি প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করেন তিনিই মাণ্ডলিক।

অন্য ব্যাখ্যায়—রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটি বিষয় লইয়া একটি মণ্ডল ধরা হয়; বৃহদায়তন মণ্ডলের অধিপতিকে মহামাণ্ডলিক বলা হইত।

ঢেক্করীর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ পিয়ুক মণ্ডলের অধিপতি ছিলেন এবং গাল্লিটিপ্যাক বিষয় তাহার অধীনে ছিল। এইসব স্থান বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ছিল।

অন্য আর একটি ব্যাখ্যা মতে তিন হইতে দশলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব প্রদানকারী বিভাগকে মণ্ডল বলা হইত।

সামন্ত— কোনও রাজ কর্ম্মচারী কোনও রাজ্য বা রাজ্যাংশ জয় করিয়া সেই রাজার প্রতিনিধি স্বরূপে সেই রাজ্য শাসন করিলে তিনি সামন্তরূপে পরিগণিত হইতেন। অথবা সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ রাজ প্রতিনিধিরূপে কোনও রাজ্য শাসনকারীকেও সামন্ত বলা হইত। একশত গ্রামাধিপতি বা এক হইতে তিন লক্ষ রাজস্ব প্রদানকারী রাজ্যখণ্ডের অধিপতিকেও সামন্ত বলা হইত। বঙ্গের রাজা রামপালের সেনাপতি কামরূপ রাজ্য জয় করিয়া প্রথমতঃ রামপালের সামন্তরূপে কামরূপ শাসন করিতেন। পরে তিনি স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন।

মহাসামন্ত— সামন্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই মহাসামন্ত। কিন্তু

মনে হয় অনেক সময় রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন না করিলেও শুধু দায়িত্ব ও পদমর্যাদা বিচার করিয়া বিশিষ্ট রাজ কর্ম্মচারীকে মহাসামন্ত পদবী দেওয়া হইত। কামরূপের নবম শতিকার রাজা হর্জ্জরবর্ম্মার প্রস্তর লিপিতে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ সুচিত্ত মহাসামন্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সপ্তম শতিকায় ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বে রাজ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ দিবাকর মহাসামন্ত ছিলেন।

মহামাত্য— প্রধানমন্ত্রী হর্জ্জর বর্ম্মার মহামাত্যের নাম ছিল গোবিন্দ। অনেক সময় এই মহামাত্যের পদবংশ পরম্পরায় পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হইতেন। তৃতীয় বিগ্রহ পালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন যোগদেব। যোগদেবের পুত্র বুধিদেব রামপালের মহামাত্য হইয়াছিলেন ; বুধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব পিতার মৃত্যুর পর রামপালের প্রধান অমাত্য ও প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন।

মহাসৈন্যপতি বা মহাসেনাপতি— ইনি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ ছিলেন।

মহাসান্ধি বিগ্রহিক— ইনি যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক ব্যাপারের অধিপতি ছিলেন। শান্তির সময় তিনি রাজকীয় ভূমিদানের দানপত্রের লেখা ও খোদাই করা নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজাজ্ঞা মতে তাম্রপত্রে শুদ্ধভাবে দানপত্র লিখিত হইলে তিনি উহা মহামাত্যের নিকট প্রেরণ করিতেন।

মহাদ্বারাধিপতি— ৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে হর্জ্জর বর্ম্মার রাজধানীর মহাদ্বারাধিপতি ছিলেন জয়দেব।

মহাপ্রতিহার— কামরূপ রাজ্য হর্জ্জর বর্ম্মার মহাপ্রতিহারের নাম ছিল জনার্দন। ইনি রাজার ব্যক্তিগত গৃহাধ্যক্ষ ছিলেন।

মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ বা মহাধর্ম্মাধিকার— ইনি আধুনিক প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

ন্যায়করণিক— খুব সম্ভব ইনি আধুনিক এড্‌ভোকেট জেনারেল ছিলেন। মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা নিধনপুর লিপিতে ভূমিদান করিবার সময় ন্যায়করণিক জনার্দনের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

মহাদণ্ডনায়ক— ইনি খুব সম্ভব সৈন্যপতি ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন ইনি ছিলেন ফৌজদারী বিভাগের প্রধান কর্ত্তা।

ব্যবহারী— যিনি আইন সংক্রান্ত নানা সন্দেহ দূর করেন, ভাস্করবর্ম্মার পুরীতে হরদত্ত ব্যবহারীর কাজ করিতেন।

কায়স্থ—কেরাণীকে কায়স্থ বলা হইত ; ভাস্করবর্মার কায়স্থ ছিলেন দুন্ধু নাথ। জ্যেষ্ঠ কায়স্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

শাসয়িতা, লেখয়িতা— দানপত্রের মুসাবিদাকারী শাসয়িতা, এবং তাম্রপত্রে খোদাই করিবার নিমিত্ত পত্রের পাঠ লিখিত লেখয়িতা।

সেক্যকার— তাম্রপত্রে দানপত্র উৎকীর্ণকারী। তাহাকে তক্ষকারও বলা হইত। নিধনপুর তাম্রলিপির সেক্যকার কলিয়া ; ধর্মপালের তাম্রলিপির সেক্যকার শ্রীবিনীত ; এবং ইন্দ্রপালের একখানি তাম্রলিপির তক্ষকার অনি, ধনি, শনি— তিন ব্যক্তি।

আজ্ঞাপ্রাপয়িতা— ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রলিপিতে শ্রীগোপাল নামক একজন কর্ম্মচারীর নামের পূর্বে একটি বিশেষ রকমের পদবী আছে— আজ্ঞাশতং প্রাপয়িতা প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দং শ্রীগোপাল। এই প্রাপ্ত পঞ্চমহাশব্দ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন— মহাসৈন্যপতি মহাপ্রতীহার ইত্যাদির যে কোন পাঁচটি উপাধিযুক্ত কর্ম্মচারী।

অন্যমত হইতেছে শিঙ্গা, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয়ঘণ্টা এই পাঁচটি যন্ত্রের ধ্বনিকে পঞ্চমহাশব্দ বলে। তন্ত্রী, তাল, ঝাঁঝ, নাগরা ও কোন একটি বাতনিনাদ-যন্ত্রের ধ্বনিকেও পঞ্চমহাশব্দ বলে। যে কর্ম্মচারীর সম্মানার্থে এই পঞ্চবিধ যন্ত্রের ধ্বনি করা হইত তাঁহাকে প্রাপ্ত পঞ্চমহাশব্দ বলা হইত।

আর একটী মত হইতেছে— পঞ্চমহাশব্দে পাঁচটি কর্মসংস্থান বুঝায়। যিনি একা পাঁচটি কর্মসংস্থানের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাকে প্রাপ্ত পঞ্চমহাশব্দ বলা হইত।

উক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন ভূমিদানের রাজাজ্ঞা ঘোষণাকারী। তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি পূর্বে এবম্বিধ শত আজ্ঞা শুদ্ধভাবে ঘোষণা করিয়াছেন,— সেই জন্য তিনি 'আজ্ঞাশতং প্রাপয়িতা' ; আবার এই ঘোষণা করিবার সময় শিঙ্গা, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয়ঘণ্টা এই পঞ্চবিধ বাদ্য লইয়া মহাধ্বনি করিয়া সমস্তলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাজআজ্ঞা প্রচার করেন— সেই জন্যই তাঁহার আর একটি বিশেষণ "প্রাপ্তপঞ্চ মহাশব্দ"— অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ বাদ্যযন্ত্র তাহার সহিত আছে, এবং এইগুলি লইয়াই তিনি রাজআজ্ঞা

প্রচার করিবেন ; মনে মনে বা চীৎকার করিয়া শুধু কয়েকজন লোকে মাত্র শুনিবে এরূপভাবে বলিবেন না।

নাবাধ্যক্ষ— প্রাচীন কামরূপের রাজাদের প্রবল নৌশক্তি ছিল ; ব্রহ্মপুত্রে অসংখ্য রণতরী থাকিত। রণতরীর অধিপতি— নাবাধ্যক্ষ।

কৈবর্ত— সাধারণ নাবিক ; আজকালকার নৌসেনা বা খালাশী।

নৌরজ্জক—নৌকার রশারশির বন্দোবস্তকারী ও তত্ত্বাবধায়ক।

নৌকাবন্ধিক—নৌকা ঠিকমতে ঘাটে নঙ্গর করিয়া রাখা হইয়াছে কি না—এই সবের তত্ত্বাবধানকারী।

নৌকুক্ষিভক্ষ সাধনী— নৌকার শুল্ক আদায়কারী।

হস্তিবন্ধিক— মাহুত ; বা হস্তীর রক্ষক।

মহাপিলুপতি— হস্তী খেদার প্রধান কর্ম্মচারী।

দূত— দেশান্তরে বার্তা বহনকারী। ভাস্করবর্মার বিখ্যাত দূত হংসবেগ।

গমাগমিক— রাজপুরী হইতে রাজার আদেশ সমন্বিত কোন বিষয়পতি, মণ্ডলাধিপতি বা সামন্তের নিকট পত্রাদি লইয়া গমনাগমনকারী।

অভিত্তরমান— উপরোক্ত কার্য্যে জরুরী বার্তা লইয়া দ্রুত গমনকারী বার্তাবহ।

কামরূপের রাজাদের প্রদত্ত যে সকল তাম্রপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ভূমির দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ অধ্যয়নান্তে কোন বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে, বা পাণ্ডিত্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিতে পারিলে রাজারা ভূমিদান করিতেন। রাজা মাতাপিতার ও নিজের যশ ও পুণ্যের নিমিত্তেও উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতেন।

যাহাদিগকে ভূমিদান করা হইত, তাহারা সেই ভূমি নিষ্করভাবে ভোগ করিতেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে কামরূপের কথা বলা হইল— ইহা কোন্ কামরূপ? প্রাচীনকালে কামরূপের পূর্ব্বসীমা শদিয়া পর্যন্ত ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বকালে বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলে ভাস্করবর্ম্মা কনৌজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সংযুক্ত হইয়া বঙ্গাধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়া উভয় রাজ্যের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেন। তখন অন্ততঃপক্ষে বর্তমান মুর্শিদাবাদ

জেলা পর্যন্ত কামরূপের পশ্চিম সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল ; দক্ষিণদিকেও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগের কথা। তারপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শালস্তম্ভ বংশীয় রাজা হর্ষবর্ম্মা নিজ রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে কোশলদেশের কিয়দংশও সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। নেপালের পশুপতি নাথের মন্দিরের দরজার চৌকাঠে ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে খোদিত লিপিতে হর্ষবর্ম্মার এই বিজয় কাহিনীর কথা উল্লিখিত আছে। সুতরাং তখন পশ্চিমে বর্ত্তমান বিহার ও দক্ষিণে উড়িষ্যার কিয়দংশ লইয়া পূর্ব্বে শদিয়া পর্যন্ত এক বিশাল কামরূপ রাজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য হিন্দু কৃষ্টিযুক্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য ; ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, রাজনীতি, সমস্ত বিষয়েই কামরূপ সর্ব ভারতীয় হিন্দু কৃষ্টির পূর্ব্বদিকস্থ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ, রাজধানীর নাম সেইজন্যই সার্থক হইয়াছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা :

স্থিরীকৃত— নির্ধারিত, যা স্থির (বা নির্দিষ্ট) করা হয়েছে। প্রফুল্লচিত্ত— আনন্দিত। সন্নিকটস্থ— কাছে অবস্থিত। উপ্ত— বোনা হয়েছে এমন। পুনরুজ্জীবিত— যা কিছু পুরনো, তাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা। অধীশ্বর— অধিপতি, মহারাজ, প্রভু। রাজ্যাপহারী— রাজ্য দখলকারী। প্রকৃতিপুঞ্জ— জনসাধারণ। উৎকীর্ণকারী— খোদাইকর, ভাস্কর। সেক্যকার— স্যাকরা (যিনি সোনা-রুপোর গয়না তৈরি করেন)। এবম্বিধ— এই প্রকার, এরকম। নিষ্কর— রাজস্বহীন, খাজনা দিতে হয় না এমন (ভূমি)। তাম্রপত্র— তামার পাতে লেখা (ভূমি দান) দানপত্র। পীতাভ— হলুদ রঙের আভাস (শরীরের রং)। সংহতিশক্তিহীন— যারা সঙ্ঘবদ্ধ নয়। সংমিশ্রিত— যে বা যারা (অন্য জাতির সঙ্গে) মিশে গেছে। আনয়ন করা— নিয়ে আসা। আনীত— আনা হয়েছে এমন। উদ্ভূত— উৎপন্ন, উদগত, প্রকাশিত। ম্লেচ্ছ— অনার্য জাতি, যবন, অন্ত্যজশ্রেণি। হর্ম্য— প্রাসাদ, সৌধ। তক্ষকার— ছুতোর (যিনি কাঠের

কাজ করেন)। ভেরী— চামড়ার তৈরি বড়ো ঢাক, দামামা। বাতনিনাদ যন্ত্র— বাঁশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। দানগ্রহীতা— যিনি দান গ্রহণ করেন। ব্যুৎপত্তি— জ্ঞান, পাণ্ডিত্য।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে ভারতের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে কোন জাতি অসমে প্রবেশ করে?

(খ) 'মিথিলা দেশের এক রাজার গৃহে অসুর বংশীয়, পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ শিশু রাজার অনুগ্রহে রাজপুত্রদের সহিত লালিত-পালিত হইয়াছিল।'—এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

(গ) রাজা পুষ্যবর্মা নিজেকে কোন বংশীয় বলে পরিচয় দিতেন?

(ঘ) নিধনপুর তাম্রলিপির সেক্যকার কে?

(ঙ) কোন মন্দিরের দরজার চৌকাঠে খোদিত লিপিতে হর্ষবর্মার বিজয় কাহিনি উল্লিখিত আছে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে ভাস্করবর্মার কামরূপের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

(খ) কামরূপের শাসনকর্তারা কাদের এবং কেন তাম্রপত্র দিতেন?

(গ) মহাসান্ধি বিগ্রহিক কে?

(ঘ) প্রাচীন কামরূপের কোন কোন বংশের রাজারা নিজেদের নরকবংশীয় বলে পরিচয় দিতেন?

(ঙ) অস্ট্রিক জাতির যে কোনো দুটি চরিত্রলক্ষণের উল্লেখ করো।

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) অস্ট্রিক জাতি কীভাবে কামরূপে প্রবেশ করে? প্রাচীন কালে এখানে তাদের উপস্থিতির কী প্রমাণ পাওয়া যায়?

(খ) কামরূপে কীভাবে নরকের একাধিপত্য স্থাপিত হল, তা লেখো।

(গ) প্রাচীন কামরূপে কোন কোন রাজবংশ রাজত্ব করেছিলেন, তার

বিবরণ দাও।

(ঘ) প্রাচীন কামরূপে কোন নীতি অনুসরণ করে রাজবংশীয়রা রাজপদ পেতেন? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

(ঙ) কামরূপ শাসননীতি অনুসারে মহাদ্বারাধিপতি, মহাপ্রতিহার ও মহাধর্মাধ্যক্ষের কাজ কী ছিল?

(চ) পঞ্চমহাশব্দ কী? তোমার পাঠ অবলম্বন করে এই বিষয়ে যা জানো লেখো।

পাঠবোধ :

মানুষ যেখানে বসবাস করে, সেখানকার ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া আসলে কালেরই দাবি। সেইসূত্রে আলোচ্য পাঠটি পড়লে এতদঞ্চলে কোন নৃগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল, কীভাবে তাঁরা একটা শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, কতদূর পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ জানা যায়। রাজা নরকের কীর্তিকাহিনিও এই সূত্রে আমরা জেনে নিতে পারি। শাসন ব্যবস্থায় কার কী দায়িত্ব ছিল সেই আকর্ষণীয় তথ্য বর্তমান রচনায় আছে।

সৃষ্টির আদিকথা ও জুমচাষ প্রচলনের কাহিনি

নিরঞ্জন চাকমা

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নানা উপজাতির বসবাস। তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি। চাকমা উপজাতির এই গল্পটি তার একটি প্রমাণ। নানা ভাষা-ভাষীর মিলনভূমি এই স্থানের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য গল্পটি পাঠক্রমে সংকলন করা হল।

লেখক-পরিচিতি :

কবি ও প্রাবন্ধিক নিরঞ্জন চাকমার জন্ম উত্তর ত্রিপুরার লালজুরি অঞ্চলের বুরসিং পাড়ায় ১৯৫১-র ২০ জুন। লেখালিখির সূত্রপাত ১৯৬৭-৬৮ থেকে। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরে সাংবাদিকরূপে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত, তারপর তিনি হন প্রকাশনা-সহায়ক। ২০09 সালে ত্রিপুরা সরকারের চাকমা ভাষায় পত্রিকা 'সদক'-এর সম্পাদকরূপে সরকারি কর্মজীবন থেকে নিরঞ্জনের অবসর গ্রহণ।

নিরঞ্জন চাকমার রচনাগ্রন্থ ন-খানা, সম্পাদিত গ্রন্থ তিনের বেশি। সম্পাদিত দুটি বই 'চাকমা ফোক অ্যান্ড মডার্ন লিটারেচার' (সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি) ও 'নবভাজিত রবীন্দ্রনামা' (রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পের অনুবাদ, তথ্য-সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা-প্রকাশিত) বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত নিরঞ্জন চাকমা ২০১১ সালে সাহিত্য অকাদেমির 'ভাষা-সম্মান' পুরস্কার লাভ করেন। চাকমা ইতিহাস, আদিবাসী জীবন, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব-বিষয়ে তিনি নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। 'সৃষ্টির আদিকথা ও জুমচাষ প্রচলনের কাহিনি'

পাঠটি রামকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত-সম্পাদিত 'ভারতজোড়া কথনকথা' (প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা) থেকে গৃহীত।

মূলপাঠ

তখন সৃষ্টির কিছুই ছিল না। না বায়ু, রোদ, বৃষ্টি, আলো, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পাখি, না মানুষ। এমনকি পৃথিবীও ছিল না। ছিল কেবল অপার-অনন্ত স্থির জলরাশি এবং নিঃসীম অন্ধকার। এমনই সৃষ্টির আদিকালে একদিন গোজেন নিজ প্রয়োজন সৃষ্টি করলেন সমুদ্রের ওপর এক বিশাল বটগাছ। সেই বটগাছ থেকে ছিঁড়ে নিলেন কয়েকটি পাতা। তা তিনি জলের ওপর বিছিয়ে তার ওপর আসন পেতে ধ্যানমগ্ন হলেন। এই মহা-ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কত শত বছর যে কেটে গেল তার হিসেব নেই। এদিকে এক বিশাল আকৃতির কাঁকড়া-দৈত্য সমুদ্রের তলা থেকে মাটি তুলে এনে তা গোজেন-সৃষ্ট সেই বিশাল বটগাছটার চারদিকের শেকড় ঘিরে জমাতে লাগল। পৃথিবীর স্থলভাগে তখন ছিল না গাছপালা, ছিল না ঘাস ও লতা-গুল্মরাজি। এমন সময় হঠাৎ একদিন গোজেনের ধ্যানভঙ্গ হল। তখন তিনি চোখ মেলে চারদিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন সমুদ্রের ওপর পৃথিবীর সুন্দর স্থলভাগ। তিনি বুঝতে পারলেন এটি তাঁরই সন্তান কাঁকড়া-দৈত্যের কাজ। তিনি পরম আনন্দিত হলেন এবং আনন্দিত চিত্তে তা ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য সমুদ্র থেকে পা বাড়িয়ে উঠে গেলেন পৃথিবীর স্থলভাগের ওপর। তিনি ভাবলেন এই পৃথিবীটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা দরকার। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করলেন দিনে আলো দেওয়ার জন্য সূর্যকে, রাত্রে জোছনা ছড়ানোর জন্য চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রদের। এরপর রুক্ষভূমিকে উর্বরা ও ছায়া-সুশীতল করার জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন গাছপালা, ঘাস, লতাগুল্মদের। রঙের জন্য ফুল, খাদ্যের জন্য ফল এবং পৃথিবীর বুকে বিচরণের জন পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গদের। এসব বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু ও মেঘমালাকে সৃষ্টি করতে তিনি ভুললেন না কিন্তু মানুষ তৈরি করার কথা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। সৃষ্টির প্রয়োজনীয় সব কিছুই করার পর গোজেন পরম আনন্দে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে দেখার সময় একবার তিনি পেছন ফিরে

তাকালেন। তাকিয়েই তিনি দেখলেন তাঁর পেছনে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন তিনি সেই লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, 'কে?' পেছনের লোকটি কোনও উত্তরই দিল না। গোজেন দ্বিতীয়বার লোকটিকে একই প্রশ্ন করলেন, এবারও লোকটি নির্বাক। তিনি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, এবারও লোকটি আগের মতোই নিরুত্তর। পর পর তিনবার প্রশ্ন করার পরও লোকটিকে নিরুত্তর দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন। তখন তিনি একটুখানি চিন্তা করেই বুঝতে পারলেন তাঁর নিজেরই ছায়া। গোজেন নিজেই যেন লজ্জিত হলেন। তখন তিনি নিজের এই ছায়াকে প্রাণ দিলেন এবং তার নাম দিলেন কেদুগা। এই কেদুগাই হল গোজেনের আদলে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব। এরপর গোজেন ভাবলেন কেদুগার একজন সঙ্গিনী প্রয়োজন। তখন গোজেন নিজের শরীরের ঘ্রিং থেকে সৃষ্টি করলেন এক মানবীকে এবং তিনি তার নাম দিলেন কেদুগী। এই কেদুগা ও কেদুগী-ই হল গোজেনসৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী। এদের সৃষ্টির পর গোজেন ভাবলেন এবার এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হল। তখন তিনি মানবসহ যাবতীয় প্রাণীকুলের আহার জোগানের দায়িত্ব ফলবান বৃক্ষরাজির ওপর ন্যস্ত করে সৃষ্টির আনন্দে পরম প্রফুল্ল চিত্তে নিজ আবাস স্বর্গরাজ্যে চলে গেলেন।

গোজেন স্বর্গরাজ্যে চলে যাবার পর কেদুগা ও কেদুগী এই দুজন আদিম মানবমানবী বন্য ফলমূল ও আলু ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করতে লাগল। কালক্রমে এদের সন্তান-সন্ততি হল, হল নাতি-নাতনি। একসময় বৃদ্ধ বয়সে কেদুগা-কেদুগী মারা গেল। এদিকে তাদের নাতি-নাতনিদেরও হল সন্তান-সন্ততি এবং নাতি-নাতনি। এভাবে তাদের বংশ বেড়ে চলল।

প্রকৃতির নিয়মে সংখ্যাতীত বৎসর কেটে যাবার পর একসময় পৃথিবীতে প্রচণ্ড হিমপাত হল। হিমপাতের ফলে পৃথিবীর গাছপালা মরে যেতে লাগল। কমে যেতে থাকল ফলবান বৃক্ষের সংখ্যা। তাতে ঘটল কভাৎ । পৃথিবী জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল। তখন মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীকুল ও গাছপালাদের রক্ষার জন্য গোজেন স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন কালেইয়্যা নামক এক দেবতাকে। কালেইয়্যা পৃথিবীতে আসার পর হিমপাত বন্ধ হল বটে কিন্তু কভাৎ আর কাটল না। তখন প্রতিকারের জন্য কালেইয়্যা পৃথিবীর যাবতীয় ফল বৃক্ষদের কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমরা কতদিন মানুষ ও অন্যান্য

প্রাণীকুলকে তোমাদের ফলমূল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?' কোনও কোনও সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ বলল, 'এক-দু মাস, বড়জোর একবছর'। কিন্তু জঘনা বৃক্ষরা বলল, 'আমরা চিরকাল এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারব।' অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এক-দুমাস যেতে না যেতেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা সব জঘনা ফল খেয়ে শেষ করে দিল। তাতে কালেইয়্যা দেবতা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে জঘনা বৃক্ষদের অভিশাপ দিলেন। এই অভিশাপের কারণে জঘনা ফল হয়ে গেল মানুষের অভক্ষ্য।

কালেইয়্যার ব্যর্থতার পর গোজেন এবার স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন গঙ্গাপুত্র বিয়াত্রাকে। বিয়াত্রা দেবতা পৃথিবীতে এসে প্রাণীকুলের জীবন রক্ষার্থে সুস্বাদু ফল ছাড়াও ভুট্টা, যব, জোয়ার ইত্যাদি চালু করলেন। কেবল তাই নয়, তিনি মনুষ্য সমাজকে শেখালেন আগুনের ব্যবহার ও গৃহ নির্মাণের কৌশল। তিনি মনস্থ করলেন পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির খাদ্যাভাব চিরতরে মেটাবার জন্য স্বর্গ থেকে মাহ্ লক্খী মা -কে পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন। তাই তিনি কালেইয়্যা দেবতাকে স্বর্গে পাঠালেন মাহ্ লক্খী মা-কে আমন্ত্রণ জানিয়ে পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য। পরিকল্পনামতো কালেইয়্যা স্বর্গে গেলেন এবং স্বর্গে পৌঁছে তিনি যথারীতি ভক্তি সহকারে মাহ লক্খী মা-কে পৃথিবীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মাহ্ লক্খী মা কোনও প্রতিশ্রুতি না দিয়ে কালেইয়্যাকে মদ্য, ভাং ইত্যাদির দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। কালেইয়্যা সাগ্রহে তা গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত মাতাল হয়ে মাহ্ লক্খী মা-কে কখনো 'মা' কখনো 'দিদি' সম্বোধন করতে লাগলেন। কালেইয়্যা দেবতার এই অবস্থা দেখে মাহ্ লক্খী মা তার সঙ্গে পৃথিবীতে যেতে রাজি হলেন না। কালেইয়্যা ফিরে আসার পর এবার স্বয়ং বিয়াত্রা দেবতা গেলেন স্বর্গে। তিনিও যথারীতি ভক্তিসহকারে মাহ্ লক্খী মাকে আমন্ত্রণ জানালেন। মাহ্ লক্খী মা তাঁকেও একইভাবে মদ্য ও ভাং সহযোগে আপ্যায়ন করলেন। বিয়াত্রা দেবতা সাগ্রহে তা গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু পান করলেন না, লুকিয়ে এক কোনায় রেখে দিলেন। তাতে মাহ্ লক্খী মা প্রসন্ন হলেন এবং বিয়াত্রার সঙ্গে পৃথিবীতে আসতে সম্মতি জানালেন। মাহ্ লক্খী মা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় ধান্যসহ যাবতীয় খাদ্যশস্যের এবং সব্জির বীজ একটি করে নিয়ে তা একটি কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে সঙ্গে

নিলেন। এরপর তিনি তাঁর প্রিয় বাহন মে-মে ছাগলী পিঠে চেপে বিয়াত্রার সঙ্গে রওনা দিলেন পৃথিবীর উদ্দেশে।

স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসার পথে বিশাল এক দুধ-সাগর। মাহ্ লক্‌খী মা তাঁর বাহনটির পিঠে চেপে সেই দুধ-সাগরের পাড়ে এসে থামলেন। তখন তিনি বিয়াত্রাকে ডেকে বললেন, 'এই দুধ সাগরটি পেরোবার জন্য একটি উপায় করতে হবে। এমন অবস্থা যে হতে পারে তা বিয়াত্রা আগেই অনুমান করেছিলেন। তাই তিনি স্বর্গে যাবার পথে আগে থেকেই একটি কাঁকড়া, একটি শূকর ও একটি মাকড়সাকে দুধ-সাগরের পাড়ে রেখে গিয়েছিলেন। তাই মাহ্ লক্‌খী মা-র নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তিন প্রাণীকে তিনি ডেকে আনলেন। এরপর বিয়াত্রার কথামতো প্রথমে কাঁকড়াটি ভাসল জলে। এরপর কাঁকড়াটির পিঠের ওপর শূকরটি গিয়ে দাঁড়াল। এদিকে করিৎকর্মা মাকড়সাটি তার পেটের আঁশ দিয়ে দুধ-সাগরের এপার-ওপার দিল বেঁধে, যাতে মাহ্ লক্‌খী মা তা ধরে ধরে দুধ-সাগরটি পেরোতে পারেন। এরা প্রস্তুত হতেই মে-মে ছাগলী পাখিটি মাহ্ লক্‌খী মা-কে পিঠে চাপিয়ে উড়ে গিয়ে বসল শূকরটির পিঠের ওপর। তখন কাঁকড়াটি দ্রুতবেগে ভেসে চলল দুধ-সাগরের ওপর দিয়ে। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাহ্ লক্‌খী মা অতি স্বচ্ছন্দে দুধ-সাগরটি পেরোলেন।

দুধ-সাগরের ওপারে গিয়ে মাহ্ লক্‌খী মা পরম সন্তুষ্ট হয়ে কাঁকড়া, শূকর, মাকড়সা এবং বিয়াত্রা দেবতাকে একটি করে বর দিলেন। তিনি বললেন, কাঁকড়াটি এবার থেকে স্থল ও জলে সমানভাবে বিচরণ করতে পারবে। শূকরটি পশুকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্বির অধিকারী হবে। মাকড়সার পেটের আঁশ কখনো ফুরোবে না এবং মনুষ্যকুলে দেবপূজার সময় বিয়াত্রা সবার আগে পূজা পাবেন। বর প্রদানের পর মাহ্ লক্‌খী মা এদের সবাইকে বিদায় জানিয়ে বললেন, 'তোমরা এবার সকলে যার যার স্থানে চলে যাও। আমি যথা সময়ে লোকালয়ে গিয়ে আবির্ভূত হব।'

এরা যে যার পথে চলে যাবার পর মাহ্ লক্‌খী মা পেঁচাকে ডেকে বললেন, 'যাও, তুমি এক্ষুনি গিয়ে রাতারাতি সর্বত্র জানিয়ে দাও যে, মাহ্ লক্‌খী মা স্বর্গ থেকে মর্ত্যধামে এসে পৌঁচ্ছছেন।' নির্দেশমতো পেঁচাটি সারা

রাত ধরে উড়ে উড়ে কু-লু-লু, কু-লু-লু শব্দে মাহ্ লক্‌খী মা-র মর্তে আগমনের খবরটি জানিয়ে দিল। কিন্তু ভোরের দিকে একটু বিশ্রামের জন্য একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল। এদিকে মাহ্ লক্‌খী মা-র মর্ত্যে আগমনের খবরটি শুনে গ্রামবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে একটি সোনার টোপর সঙ্গে নিয়ে সেই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপনকারী পাখিটির খোঁজে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর গিয়েই তারা দেখতে পেল একটি কাঠঠোকরা পাখি একটি মরা গাছের ডালে বসে ঠোকর মারছে পোকার সন্ধানে। গ্রামবাসীরা ভাবল এটিই বুঝি সেই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপনকারী পাখিটি ! তাই তারা এই কাঠঠোকরা পাখিকেই সোনার টোপরটি পরিয়ে দিল। এদিকে ঝোপের আড়াল থেকে পেঁচাটি তা দেখতে পেয়ে কেবল আক্ষেপের সুরে স্বগতোক্তি করে বলল, 'সারারাত পরিশ্রম করলাম আমি, অথচ একটুখানি অলসতার দরুন সোনার টোপরটি বিনা পরিশ্রমে পেয়ে গেল কাঠঠোকরা পাখিটি।'

২

মাহ্ লক্‌খী মা ভাদ্র মাসের মঙ্গলবারে অপরাহ্ণ বেলার সময় লোকালয়ে এসে আবির্ভূতা হলেন সাধারণ সাদা পোশাক পরিহিতা মধ্য-বয়েসি এক বিধবা নারীর বেশে। তিনি প্রথমেই গিয়ে উঠলেন মিচ্ছিঙ্যা নামক এক বিপত্নীক গৃহস্থের বাড়িতে। তখন মিচ্ছিঙ্যা বাড়িতে ছিল না, গিয়েছিল খাদ্যের সন্ধানে। তার ছোট ছোট তিন মেয়ে ছিল বাড়িতে। তারা নিরন্ন অবস্থায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। মধ্যবয়েসি বিধবা মহিলাটি মেয়েদের জাগিয়ে তুললেন। প্রথমে তিনই তাদের পরিচয় জেনে নিলেন। এরপর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বললেন দূরগ্রাম থেকে এসেছেন। পরিচয় জানাজানির পর তিনি বারো-তেরো বছর বয়েসি মিচ্ছিঙ্যার বড়ো মেয়েটিকে ডেকে বললেন, 'তুমি একটি লেই[৬] নিয়ে এসো।' কথামতো মেয়েটি লেই নিয়ে এল। বিধবা মহিলাটি তাঁর কাপড়ের পুঁটলিটি খুলে তা থেকে একটিমাত্র চাল খুঁজে তা ঝুড়িটির মধ্যে রেখে দিলেন এবং একটি কুলো দিয়ে ঝুড়িটি ঢেকে দিলেন। এবার মেয়েটিকে তিনি বললেন, 'উনুনের আগুন জ্বেলে তুমি এই ঝুড়ি থেকে পরিমাণমতো চাল নিয়ে একটি হাঁড়িতে রান্না করো। আমরা সবাই মিলে খাব।' মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে মহিলাটির

দিকে এক পলক তাকিয়ে ঝুড়ি থেকে চাল মেপে নিয়ে তা হাঁড়িতে রান্না বসিয়ে দিল। রান্নার কাজ শেষ হলে মহিলাটিসহ তারা সবাই মিলে পেট ভরে খেল। সন্ধে ঘনিয়ে আসার একটু আগেই মিচ্ছিঙ্যা কয়েক টুকরো বন্য আলু নিয়ে বাড়ি ফিরল। বিধবা মহিলাটি তখন ঘরের এক কোনায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। বাড়িতে এসে মিচ্ছিঙ্যা নিজের মেয়েদের মুখ থেকে বিধবা মহিলাটির বিষয়-বৃত্তান্ত সবই শুনল কিন্তু তেমন কিছু বুঝে উঠতে পারল না। পরে নবাগতা মহিলাটির সঙ্গে তার পরিচয় ও আলাপ হল। বিধবা মহিলাটি জানালেন তিনকুলে তাঁর কেউ নেই। এ বাড়িতে আশ্রয় পেলে তিনি চিরদিনের জন্য থেকে যাবেন। তা শুনে মিচ্ছিঙ্যা মনে মনে খুশিই হল এবং মহিলাটিকে থেকে যেতে বলল। কিছুদিন যেতে না যেতেই মিচ্ছিঙ্যা ও মহিলাটির বিবাহ হল।

এভাবে বুড়ি ও মচ্ছিঙ্যা ঘর-সংসার পেতে তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে লাগল। একদিন মাঘ-ফাল্গুন মাস নাগাদ বুড়ি মিচ্ছিঙ্যাকে ডেকে বললেন, 'বুড়ো, আজ তুমি জঙ্গলে গিয়ে একটি জুমের স্থান চিহ্নিত করে এসো।' মিচ্ছিঙ্যা ছিল আসলে খুবই অলস প্রকৃতির লোক। তবু বুড়ির কথায় সেদিন জঙ্গলে গিয়ে একটি উর্বর জায়গা দেখে চিহ্নিত করে এল। এর কদিন পর বুড়ি পুনরায় মিচ্ছিঙ্যাকে ডেকে বললেন, 'বুড়ো আজ তুমি জঙ্গলে গিয়ে আবার ওই জুমের কিছু জঙ্গল কেটে এসো।' বুড়ির কথায় বুড়ো মিচ্ছিঙ্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি তাক্কল[৭] ও একটি কুড়ুল নিয়ে জুমটির কিছু অংশের জঙ্গল কেটে সন্ধেয় বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু বুড়ো পরের দিন জুম কাটতে গিয়ে দেখে সব জঙ্গল কাটা হয়ে গেছে। সে জুমের সব ঝোপ-ঝাড় রোদে শুকোতে লাগল। চৈত্রের শেষদিকে বুড়ির কথামতো বুড়ো কাটা ও শুকনো গাছপাতা আগুনে পোড়াল। বুড়ি তার দু-একদিন পরে বুড়োকে বাড়িতে রেখে নিজেই জুমে গেলেন। তিনি সেদিন জুমের আধপোড়া ডালপালা সব পরিষ্কার করে জুম খেতে ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ রোপণ করে এলেন। এরপর আরেক দিন বুড়ি জুমে গিয়ে জুমের যাবতীয় বুনোঘাস ও আগাছাগুলো সাফ করে জুমের উত্তর প্রান্তে একটি বিরাট গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে গর্তের মুখটি পাথর চাপা দিয়ে এলেন। এর বেশ কয়েকদিন পর বুড়ি বুড়োকে বললেন, 'বুড়ো, আজ তুমি জুমে গিয়ে দেখে এসো বাঁদর বা অন্য বন্যপশু

জুমের ফসল নষ্ট করছে কিনা। কিন্তু একটি কথা মনে রেখো তুমি কক্ষনো জুমের উত্তর দিতে যাবে না।' বুড়ো সেদিন জুমে গিয়ে দেখলে সুন্দর জুমক্ষেত। ঘাসগুলো সব নিড়ানো। কচি-সবুজ ধানের চারাগুলো বাতাসে দুলছে। দেখে বুড়োর মনটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে আনন্দ চিত্তে জুমের এদিকে-ওদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ-ই তার মনে পড়ল বুড়ির নিষেধের কথা। সে ভাবল বুড়ি কেন জুমের উত্তর যেতে নিষেধ করলেন ! তার মনে কৌতূহল জাগল। সে নিষেধ অগ্রাহ্য করে গেল জুমের উত্তরে। কিন্তু সেদিকে গিয়েই বুড়ো শুনতে পেল কাদের যেন গলার চাপা আওয়াজ। সেই আওয়াজ উদ্দেশ করে খোঁজাখুঁজি করতেই দেখতে পেল একটি গর্তের মুখে একটি পাথর চাপা রয়েছে। গর্তের কাছাকাছি গিয়ে কান পাততেই শুনতে পেল কারা যেন গর্তের ভেতর গুমরিয়ে কাঁদছে। বুড়ো কৌতূহল নিবারণের জন্য সেই গর্তের মুখে চাপা দেওয়া পাথরটি দু-হাত দিয়ে সরিয়ে দিল এবং অবাক হয়ে দেখল গর্তের ভেতর ঠাসাঠাসি করে পড়ে রয়েছে অজস্র বুনোঘাস ও আগাছা। গর্তের মুখটি খুলে দিতেই তারা হুড়মুড়িয়ে বেড়িয়ে এসে সারা জুম খেত জুড়ে যার যার জায়গায় ঝট্‌পট বসে পড়ল। এ কাণ্ড দেখে বুড়ো রীতিমতো চমকে গেল। তখন বুঝতে পারল বুড়ি কেন জুমের উত্তর প্রান্তে যেতে বারণ করেছিলেন। বুড়ো অপরাধীর মতো কাঁচুমাচু অবস্থায় বাড়িতে ফিরে এসে সব ঘটনা বুড়িকে খুলে বলল। তা শুনে বুড়ি বলল, 'বুড়ো তুমি জুমচাষিদের নিড়ানির কাজটা শুধু শুধু বাড়িয়ে দিয়ে এলে।' যা হোক, বুড়ি পরের দিন নিজেই জুমে গেলেন। বুড়িকে দেখা মাত্রই জুমের বুনোঘাস ও আগাছা যেদিকে পারে দৌড়ে পালাতে লাগল। তবু তিনি কিছু বুনোঘাস ও আগাছাকে ধরে আবার সেই গর্তের ভেতর পাথর চাপা দিয়ে চলে এলেন।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস নাগাদ বৃষ্টির জল পেয়ে জুমের ধান ও সবজির চারাগুলো বেড়ে উঠতে লাগল। এক সময় সেই ধানের চারাগাছে ফুল এল, ফুল থেকে হল ধান। ক্রমশ সেই ধান পুষ্ট হতে হতে পেকে ওঠার সময় হল। ধানের শিষে সোনালি রং ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শ্রাবণের শেষ ও ভাদ্রের প্রথম নাগাদ জুমের ধান পুরোপুরি পেকে উঠল। তখন বুড়ি বুড়োকে ডেকে বললেন, 'বুড়ো, এবার যাও তুমি গ্রামে গিয়ে গেরস্থকে জানিয়ে দিয়ে এসো

যে, তারা সবাই যেন নিজেদের প্রয়োজনমতো জুম থেকে পাকা ধান কেটে নিয়ে যায়।' বুড়ির কথামতো বুড়ো প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি গেরস্তকে খবরটি জানিয়ে দিয়ে এল। তারপর নির্দিষ্ট শনিবার দিনে দূর-দূরান্তের প্রতিটি গ্রাম থেকে নারী-পুরুষেরা হাতে কাস্তে নিয়ে, বড় বড় বেতের ঝুড়ি কাঁধে ঝুলিয়ে, মিচ্ছিঙ্যা বুড়োর জুমক্ষেতে এসে হাজির হল।

এদিকে বুড়ি বুড়োকে দিয়ে জুমের মাঝখানে একটি উঁচু বেদি তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। গ্রামবাসীরা সবাই এসে জড়ো হলে বুড়ি সেই বেদির উপর উঠে গেলেন এবং নিজেকে মাহ্ লক্খী মা বলে আত্মপরিচয় দিয়ে সমবেত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ করে জুমচাষের মাহাত্ম্য, জুম কৃষির প্রতিটি পর্বের কাজ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, 'আমি যে গৃহস্থের বাড়িতে অবস্থান করি সেই গৃহস্থের পরিবার সর্বদা ধনে-সম্পদে, বিত্ত-বৈভবে পরিপূর্ণ থাকে, অভাব বলতে কিছুই থাকে না। কিন্তু আমি কেবল সুগৃহিণী ও সৎচরিত্র ব্যক্তিদের ঘরেই অবস্থান করি। যে ঘরে সকাল-সন্ধে অকথ্য ভাষা উচ্চারিত হয় সে ঘরে আমি থাকি না। যে নারী কটুভাষী, হিংসা-পরায়ণা, পতিভক্তিহীনা, পরগামী সে ঘরে আমি থাকি না। যে নারীর স্বামী অলস, মদ্যপ, জুয়াখেলায় আসক্ত, ব্যভিচারী, পরনারী হরণকারী এমন ঘরে আমি থাকি না।' তিনি আরো বললেন, 'আমি বিয়াত্রা দেবতার আমন্ত্রণে মনুষ্যজাতির অন্ন সংস্থানের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলাম। এই জুমচাষের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করে গেলাম। এখন স্বর্গে স্বগৃহে ফিরে যাব। স্বশরীরে আর পৃথিবীতে থাকব না। তবে আমি অদৃশ্যভাবে চিরকাল অবস্থান করব ধানছড়া এবং ধান ও চালের ঝুড়িতে। যে আমার নীতিমালা মান্য করে চলবে আমি সদাসর্বদা তারই ঘরে দৃশ্যাতীতভাবে বিরাজমান থাকব।' এই কথাগুলো বলে মাহ্ লক্খী মা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে পুনরায় স্বর্গে চলে গেলেন।

---

১. গোজেন : ঈশ্বর।
২. ঘ্রিং : ময়লা।
৩. কভাৎ : মন্বন্তর।
৪. মাহ্ লক্খী মা : মহালক্ষ্মী মা।

৫. মে-মে ছাগলী : এক ধরনের ছোট্ট পাখি।

৬. লেই : বেতের ঝুড়ি।

৭. তাক্কল : দা।

শব্দার্থ ও টীকা :

রৌদ্রকরোজ্জ্বল— ভরা রোদ। নিরুত্তর— উত্তরহীন। ন্যস্ত— অর্পিত। সংখ্যাতীত— যা সংখ্যায় গণনা করা যায় না বা সংখ্যায় অনেক। প্রসন্ন— খুশি। করিতকর্মা— যে কাজে দক্ষ। অপরাহ্ন — দুপুরের বা মধ্যাহ্নের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত; বিকাল। জ্ঞাপনকারী— যে খবর জানায়। ব্যভিচারী— যে অনৈতিক আচরণ করে; অমিতাচারী।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) 'সৃষ্টির আদিকথা ও জুমচাষ প্রচলনের কাহিনি' গল্পটি কোন উপজাতি-সম্পর্কীয়?

(খ) পাঠ্য গল্পটির লেখক কে?

(গ) চাক্‌মা ভাষায় ঈশ্বরকে কী বলে?

(ঘ) গোজেনের সন্তানের নাম কী?

(ঙ) হিমপাত বন্ধ করার জন্য গোজেন কাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?

(চ) কালেইয়্যার ব্যর্থতার পর গোজেন কাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?

(ছ) ছদ্মবেশী মাহ্ লক্‌খী মা কাকে বিয়ে করেছিলেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) গল্পটিতে উল্লেখ আছে এমন কিছু দেব-দেবীর লেখো।

(খ) গোজেনের আদলে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবীর নাম কী?

(গ) জঘনা ফল মানুষের অভক্ষ্য হয়ে গেল কেন?

(ঘ) প্রচণ্ড হিমপাতের ফলে পৃথিবীতে কী হয়েছিল?

(ঙ) সোনার টোপর কার, কেন প্রাপ্য ছিল? কে পেয়েছিল এবং কেন?

(চ) কোন মাসের, কোন বার, কোন সময় মাহ্ লক্খী মা কোন ছদ্মবেশে লোকালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) কালেইয়্যার ব্যর্থতার পর গোজেন কাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? তিনি এসে কী করেছিলেন?

(খ) কার আমন্ত্রণে মাহ্-লক্খী মা পৃথিবীতে এসেছিলেন? তিনি এসে প্রথমে কী করেছিলেন?

(গ) দুধ-সাগর পার করার সময় মাহ্ লক্খী মাকে কারা সাহায্য করেছিল? তিনি তাদের কী কী বর দিয়েছিলেন?

(ঘ) মাহ লক্খী মা লোকালয়ে এসে কী করেছিলেন বিস্তারিত লেখো।

পাঠবোধ :

প্রত্যেক জাতি-উপজাতির জীবনে কিছু লোকবিশ্বাস আছে। চাকমা-জীবনের এ রকম একটি লোকবিশ্বাসের কথা এই গল্পে পাওয়া যাচ্ছে।

তাসের ঘর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক, গল্পকার। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিবিড় পরিচিতি, দেশাশ্রয়ী মানসিকতা, নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি, বিষয়ানুগ বলিষ্ঠ ভাষা, প্রবল হৃদয়াবেগ। তারাশঙ্করের বক্তব্য বিষয় এতই বলিষ্ঠ ও প্রবল আবেগসম্পন্ন যে তাঁর ছোটগল্পের কলারীতিতে বাস্তবতা ফুটে ওঠে। নিমেষে তিনি তাঁর সাহিত্য জগতের মর্মে আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। যাদের নিয়ে লেখেন, তাদের জীবনের প্রবল ও গভীর আবেগ, অনুভূতির সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে যাই।

'তাসের ঘর' ছোটগল্পে দেখি নায়িকা শৈল-র প্রতি, তার সমস্ত মিথ্যাভাষণকে প্রশ্রয় দিয়ে, আমরা একসময় সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। এই গল্পের এখানেই নাটকীয়তা। আর এই নাটকীয়তা ও দরদ সৃষ্টিতে, লেখকের লেখনীর মুন্সিয়ানার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই গল্পটিকে পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি :

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা প্রভাবতী দেবী। তাঁর বাল্যজীবন কাটে গ্রামের পরিবেশে। লাভপুরের যাদবলাল হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে পড়াশোনার ইতি হয় সেখানেই। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ১৯৩০ সালে

কারারুদ্ধ হন। এক বছর পর মুক্তি পেয়ে তিনি সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন। অবশ্য এর আগে 'ত্রিপত্র' কবিতা সংগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালে। গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন চরিত্র তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ ইত্যাদি সবই তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। নানা পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরৎস্মৃতি পুরস্কার ও জগত্তারিণী স্মৃতিপদক, রবীন্দ্র-পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। এ ছাড়া পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধিতেও ভূষিত হন তিনি। তারাশঙ্কর ১৯৭০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, এর আগে বিভিন্ন সভা-সমিতির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৪২-এ ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংগঠনের সভাপতিও হয়েছিলেন। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লেখায় বিশেষভাবে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর অনেক গল্প উপন্যাসের বিষয়। সেখানে আছে গ্রাম জীবনের ভাঙন ও নগরজীবনের বিকাশের কথা। তাঁর বহু গল্প, উপন্যাস ও নাটক নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'জলসাঘর'। তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাসের নাম 'চৈতালী ঘূর্ণি।' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে— 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কবি', 'পদচিহ্ন' ইত্যাদি উপন্যাস এবং 'কালাপাহাড়', 'বেদেনী', 'ডাইনী', 'রসকলি' প্রভৃতি গল্প। ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এই মহান সাহিত্যিকের দেহাবসান ঘটে।

মূলপাঠ :

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের একটা সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ-পেয়ালা চা-দানি ইত্যাদি রং চং করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়— চার টাকা— মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের কোরো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন ; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন চায়ের সেটটা আজ বের করো তো গৌরী।

গৌরী বাড়ির মেয়ে— অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান সিলভারের ট্রে সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হল? এই দেখো বাপু, সবে এই আমি বের করে আনছি, আমায় দোষ দিও না যেন!

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখো না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না।

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল, সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ। তোমরা সব চোখ কপালের উপর তুলে কাজ করো, নিচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়তো কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না। পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা— বউমা।

বউমা— অমরের স্ত্রী শৈল— উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ির কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকছেন?

শাশুড়ি বাসন-অন্ত প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মতো সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউরিদের, না ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ি বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কী হল?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ওটা আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ি কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কি আর বলব বলো।

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে, অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ি বলিলেন, ও পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই সহ্য করে, সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ি বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও ওপরের কাজ সেরে এসো, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ির কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ির মনের উত্তাপ কমিয়া আসিতেছিল, বলিলেন, নাও, তোমাদের দেশের মতো খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরেই মাছের পুর দোবো তো মা?

অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বই কি, বিধবা তো কেউ আসছেন না!

ময়দার ঠোঙার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিং দেওয়া হত— ভারি চমৎকার হত। বাবার আবার হিং ভিন্ন কোনো জিনিস ভালো লাগে না। আর যে-সে হিং আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না; আফগানিস্থান থেকে কাবুলিরা সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ি বলিলেন, পশ্চিম ভালো জায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সেসব জিনিস পাওয়া যায়?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিং পাওয়া যায় না মা। কাবুলিরা সেসব নিজেদের জন্যে আনে শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকা-কড়ি অনেক সময় নেয়— তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিং, যখন আসবে তখন

প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাসপাতি, বাদাম, হিং— এসব ছোট ছোট ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত। কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ি এবং বধূতে কলহ বাঁধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ি বলিলেন, যা হবে তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না ; দোষ করলে বকব কি। মুখের দিকে চাইলে মায়া হয় !

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না ! সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়তো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কননি। শেষে মা আবার বলে কয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক— খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাতকাটা— এতটুকু ; তামাক না, বিড়ি না— সে এক বাতিকের মানুষ।

— শাশুড়ি বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও ; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে !

শৈল বলিল, ছোট মাছ— কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা ; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক শিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষণো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু-সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও ; তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে চুলটুল বেঁধে ফেলগে।

কেশ প্রসাধন অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল উঃ, রং বটে তোমার বউদি। তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখো না যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকে দিতাম। আমার আর কি রং দেখছ! বাবা-মা-দাদা আর আমার অন্য বোনেদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রং কাকে বলে ; ঠিক একেবারে গোলাপ ফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বলো কি বউদি, তোমার চেয়ে ফরসা রং?

হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ি আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওঁরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড়টা দিয়া বলিল, এই যে মা, হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল— নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মতো।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসি মুখে প্রণাম করিল।

ও বাড়ির গিন্নি বলিলেন, এ যে চাঁদের মতো বউ হয়েছে তোমার দিদি। লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়িনি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড শেষ হয়েছিল ; তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে হইয়া গেল।

ও বাড়ির গিন্নি বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কী যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না। আমার বউরা তো কলেজে পড়ছিল সব ; বিয়ের পর ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনরা সব ভালো করে পড়েছে, বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন— বছরে পাঁচ-সাত শো টাকার বই কেনেন— বাংলা, ইংরিজি! বিলেত থেকে ইংরিজি বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা, কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজনেস আছে— সেই বিজনেস

দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নেই।

কোথায় তোমার বাপের বাড়ি?

এলাহাবাদ। এলাহাবাদে গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিনপুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কন্ট্রাক্টরি করেন।

কিরকম পান-টান?

আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজোভাই বলেন মাঝে মাঝে, এরকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বলো। পাকা বাড়িগুলো সব ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টাঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মোটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি। গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে— মহেন্দ্রবাবু এক হিসেবে সন্ন্যাসী!

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু মিষ্ট হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নি এবার শৈলর শাশুড়িকে বলিলেন, তা হলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্বতল্লাশ করেন কেমন বেয়াইরা?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন কথায় কে যে আঘাত পায় সে বোঝা, বোধ করি বিধাতারও সাধ্য নয়! তোমাদের চেয়ে বড় ঘর— এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন। তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের এই, বাপেদের ওই ; কিন্তু তত্ত্ব-তল্লাশ তো দেখি না, আজ দু-বছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই!

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন। তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম সে আবার আমি কেন 'আমার' বলে আমার ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম— সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্বতল্লাশ

এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন তখনই দেবেন।

শাশুড়ি বলিয়া উঠিলেন, কী বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন— কখন, কোন কালে?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলিনি মা ; আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন, একশো পঞ্চাশ আশি— চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না?

শাশুড়ির মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী— দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না।

ও বাড়ির গিন্নি বলিলেন, তোমায় হয়তো বলেনি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ !

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তার আয়তন, সংকীর্ণ তার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন তাই মাসে দুইবার করিয়া সে বাড়ি আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অস্বচ্ছতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপ করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটা মাখিয়া শাশুড়ির আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম— কাল অগ্নির উত্তাপও হরণ করিয়া থাকে, মনের আগুনও নিভিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ির মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে

এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালোভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিশে এক দফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বার বার সংকল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোন কথা লিখিতে পারে নাই— কোনো অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে, তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে ; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মতো নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলির সহিত।

এই আধ মাইল— মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু-আনা দিলাম— আবার কত দোবো?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায়? তখন যে একেবারে হুকুম ছাড়লেন— এই— ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে, দ্যান, দিতে হবে !

নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি— এই নে পয়সা— কিন্তু এক্ষুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

দেখ না, লোকসান যেদিন হয় সেদিন এমনি করেই হয়। পঞ্চাশ টাকা মেরে একজন পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান !

মাও বোধকরি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে আর তোমার চিন্তা কী বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখো, তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝিলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যেই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব— তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর টাকা পাঠিয়ে দেন— একশো, পঞ্চাশ, আশি যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে কোন হারামজাদা, হারামজাদী সেকথা বলে?

মা ডাকলেন, বউমা।

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে— কী করিবে, কী বলিবে, কোন নির্ধারণ সে স্থির করিতে পারিল না।

শৈল বিহ্বলের মতো বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো!

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মতো দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল। মা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে, এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে স্বেচ্ছাচার। তাই ওইটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল, সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদে রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোক গিলিয়া বলিল, কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া মা বলিলেন, ওরে আনতে কি অসাধ, না আমার মনে ব্যথা হয় না ; কিন্তু কী করব, বল?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে বাজার নাকি বড় মন্দা। তার ওপর হেমির বিয়ে এসেছে— খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে, শৈল, জামাই?

শৈল বিবর্ণমুখে বলিল, না আমার দেওর এসেছে।

কই সে, ওমা বাইরে কেন সে? ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ তো বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো! বল, মা ডাকছেন। শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন এখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই কেউ তো নেই।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কী? কোথায় গেল সে?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন। ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে— সে কি?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা— একটা বড়ো কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, সেই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফিরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধহয় পারবে না, খুব জরুরি কাজ কিনা। সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, সময় তো পৌঁছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়োদাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখিন খদ্দরের পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ। শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই সকালে দাদা, ভালো আছেন আপনি?

হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাংলা দেশের মানুষ— কই

দে তো এই চারগুলো তৈরি করে, দেখি তোর হাতের কেমন পয়! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে— এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব।

তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে?

আমাদের পুকুরে খুব বড় মাছ।— আধ মণ, পনেরো সের পঁচিশ সের এক একটা মাছ। জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বলল, বউদিকে কুটতে হবে। ওরে বাপরে, সে যা আমার ভয়। এখন আর ভয় হয় না— আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস— তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা দেখব, আমাদের কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোমাদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনেছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন জামাই এখন বেশ পাচ্ছে, না রে শৈলী? শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরেই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন মা। তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখো, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখো।

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি, শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতির সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যিই তিনি সাধুপ্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন, লিখিলেন—

আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আশাকরি— প্রার্থনা করি, সে

অনুগ্রহ হইতে আমি আমার শৈল যেন কখনো বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না সেখানে কী ঘটিয়াছে, শৈল কী অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোনো কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই আপনার কোনো আশীর্বাদ তো আসিল না। শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোনো পত্র দেন না। দয়া করিয়া কী ঘটিয়াছে আমাকে জানাইবেন ; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—

অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজোছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি.এ-তে সে যোগ্য স্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চোখে জল আসিল।

মনে তাঁহার যে ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে, সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মতো মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁর প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন— কলিকাতায় বাড়ি ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—

বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোনো অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধ হয় ধরা পড়েনি। ওগুলো মাঝলা জাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হল। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো আর কারও হয় না।

রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কী বলো তো? 'একটা বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোলো আনা একটা পুকুরই নেই, অথচ— ছিঃ। আর 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে। আমার জন্য ঝুটা মুক্তার একছড়া'— ওকি— ওকি, কাঁদছ কেন শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সেকথা যে তাহার অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়।

শব্দার্থ ও টীকা ঃ

রোষকষায়িত— ক্রোধে আরক্ত বা রেগে যাওয়া অবস্থা। অবকাশ— বিরাম, অবসর, ফুরসত। প্রসাধন— অঙ্গসজ্জা, অঙ্গশোভাবর্ধন। প্রবাসিনী— বিদেশে বাসকারী মহিলা। অত্যুক্তি— অতিরঞ্জিত বর্ণনা বা উক্তি, বাড়িয়ে বলা। বিদূরিত— দূর হয়েছে এমন, দূরীভূত, বিতাড়িত। তত্ত্বতল্লাশ— কুটুমের বাড়িতে লোকাচার-অনুযায়ী উপহার পাঠিয়ে খোঁজখবর নেওয়া। লৌকিকতার আচরণ। উপাধান— বালিশ, শিয়রে রাখার নরম গদি।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম করো।

(খ) অমর শখ করে চায়ের বাসনের যে সেটটা কিনেছিল তার দাম কত?

(গ) অমরের স্ত্রী-র নাম কী?

(ঘ) অমরের জীবিকা কী ছিল?

(ঙ) শৈল-র বাপের বাড়ি কোথায়?

(চ) শৈলের বাবার (পিতার) নাম কী?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) "বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন কথায় কে যে আঘাত পায় সে বোঝা, বোধ করি বিধাতারও সাধ্য নয়"— এখানে কার মনের কথা বলা হয়েছে? এবং সে কোন কথায় আঘাত পেয়েছে, প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখো।

(খ) কলকাতা প্রবাসিনী গিন্নিদের সামনে শৈল বাপের বাড়ির তত্ত্বতল্লাশ সম্বন্ধে কী বলেছিল?

(গ) "শৈলর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল"— শৈল-র মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কারণটি কী?

(ঘ) অমর বলিল "ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না,"— এখানে ও বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? আর অমর ও বাড়িতে থাকলে কেন জলগ্রহণ করবে না?

(ঙ) শৈলর বাপের বাড়ি লোক এতদিন পর্যন্ত শৈলকে বাপের বাড়িতে আনেনি কেন?

(চ) শৈলর পিতা কী ধরনের মানুষ ছিলেন?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) "বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে স্বেচ্ছাচার"— এখানে কোন বিচারের কথা বলা হয়েছে? বিচারের নামে কীরূপ স্বেচ্ছাচার গল্পে দেখা যাচ্ছে?

(খ) "তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখো, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখো।"— এখানে কে কাকে পত্র লিখতে বলেছেন? এবং পত্রের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

(গ) "পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চোখে জল আসিল।"— কার পত্র পড়ে এবং কেন অমরের মায়ের চোখে জল এসেছিল সংক্ষেপে লেখো।

(ঘ) শৈল তার বাপের বাড়িতে শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে কীসব (অলীক) গল্প করেছিল?

(ঙ) অমরের কাছে শৈল পত্রে কী কী আনতে লিখেছিল এবং কেনই বা, লেখো।

পাঠবোধ :

সাংসারিক পরিবেশে, ঘরোয়া বিষয়বস্তু নিয়ে লেখক তারাশঙ্করের 'তাসের ঘর' গল্পটি রচিত।

অমরের স্ত্রী শৈল শ্বশুরবাড়িতে বাবার বাড়ির (বাপের বাড়ির) মিথ্যা মহিমা এবং বাপের বাড়িতে শ্বশুরবাড়ির অলীক সংবাদ রটনায় যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে, সম্ভবত সে কারণে সে পতি-পরিত্যক্তা হয়েও পুনর্বার শাশুড়ির হৃদয়ে স্থান ও স্বামীর ভালোবাসা আদায় করতে পেরেছে। গুরুজনেরা সকলেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তার অনৃতভাষকে অমৃতভাষণে পরিণত করে নিয়েছেন। সাংসারিক পরিবেশে একটি তুচ্ছ চরিত্রধর্মকে কেন্দ্র করে লেখক একটি বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক গল্প সৃষ্টি করেছেন।

আদাব

সমরেশ বসু

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

গল্পটিতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার একটি ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা তখন উপস্থিত হয় তখন হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে জীবন রক্ষার তাগিদ অনুভব করে এবং চেষ্টা করে। আসলে সাধারণ মানুষ কখনোই কোনো ভেদাভেদ করেনি। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি রয়েছে। রাজনীতি সেখানে ভাঙনের সৃষ্টি করে। এই বোধ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পাঠটি গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি :

সমরেশ বসু বিশ শতকের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর ঢাকার বিক্রমপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর কাটে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটি শহরে। স্কুলের পাঠ শেষ না হতেই তাঁকে রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়তে হয়। নানা রকমের কাজ করেছেন তিনি। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সমরেশ বসু ইছাপুর বন্দুক কারখানায় চাকরি করেন। সেখানেই তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন ; ১৯৪৯-৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি পুরনো চাকরিতে বহাল হতে অস্বীকার করেন এবং লেখালিখিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

ছোটোবেলায় মায়ের কাছে শোনা ব্রতকথা সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। জেলে বসে তিনি লিখেছিলেন ‘উত্তরঙ্গ’ উপন্যাসটি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ‘নয়নপুরের মাটি’ উপন্যাসটি লেখেন। এটি ধারাবাহিক হিসাবে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়। তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব'ও পরিচয় পত্রিকায় ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় দুশোটি ছোটোগল্প আর একশোখানা উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর ছদ্মনাম 'কালকূট'। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই ছদ্মনামটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। এ ছাড়া আরেকটি ছদ্মনাম হল 'ভ্রমর'। কালকূট ছদ্মনামে লেখা সমরেশের উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' ও 'শাম্ব'। 'শাম্ব' উপন্যাসটির জন্য ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সমরেশ বসু সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ছোটোদের জন্যও তিনি প্রায় ১৪-১৫টি বই লিখেছেন। তাঁর গোগোল চরিত্রটি ছোটোদের খুব প্রিয়। ছোটোদের জন্য লেখা গল্প অবলম্বনে 'গোয়েন্দা গোগোল' নামে একটি চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাস নিয়েও চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। যেমন—'কলকাতা ৭১', 'নির্জন সৈকতে', 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'উত্তরা', 'বিবর', 'পার' (হিন্দি)। সমরেশ বসুর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল 'অচিনপুরের কথকতা', 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'বি টি রোডের ধারে', 'গঙ্গা', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'তিন ভুবনের পারে' ইত্যাদি।

১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক পরলোকগমন করেন।

মূলপাঠ :

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডর জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল— চোরাগোপ্তা হান্‌ছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যুবিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে

তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না।— 'আল্লাহু-আকবর' কি 'বন্দেমাতারম্'।

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত-পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।...নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা... ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটি মাথা। মানুষ ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনি। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল— হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয় তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না— ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তির অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে— হিন্দু না মুসলমান?

— আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের

মন দুলছে। ...প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে— বাড়ি কোনখানে?

— বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইডায়। তোমার?

— চাষাড়া—নারাইণগঞ্জের কাছে। ...কী কাম করো?

— নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি।— তুমি?

— নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে। ...হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দুপক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সূতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

— ধারে-কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

— হ, চলো এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল : আরে না না— উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল— বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ— সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলে— ক্যান?

— ক্যান? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল— ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল— যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা?

— এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

— ভালো কথাই কইছি ভাই ; বইয়ো, মানুষের মন বোঝো না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

— তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব— মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকারে গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলে মেয়েদের কথা...তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে...কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি— আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি— একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কী অভিশপ্ত জাত ! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

— বিড়ি খাইবা? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু'-একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খসখস শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে—উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

— হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া।— আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

— আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি— আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খসখস করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

— সোহান্ আল্লা !— নেও নেও— ধরাও তাড়াতাড়ি।...ভূত দেখার মতো চমক উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

— তুমি...?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দুজোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট করে উঠে দাঁড়াল। বলল— হ আমি মোছলমান।— কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল— কিছু হয় নাই, কিন্তু...

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

— পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

— আর কিছু নাই তো !— সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

— মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখো।— পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

— আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়— তুমিই কও?

— হেই তো হক্ কথাই। ভাই— তুমি কিছু রাখো-টাখো নাই তো?

— ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটাও সুঁইও নাই। পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামাকাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ সহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

— আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

— আইচ্ছা— আমারে কইতে পারনি— এই মাই'র-দ'ইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল সে— দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল— হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?

— আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা— হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।— তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

— মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি ; নাইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেমবায়?— নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দুহাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

— হ।

— আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল— অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি ; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে— তার ঠিক কি? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান হজরতের হাত, বখশিশ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

— কী করব? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটাকে বগলদাবা করে।

— চলো পলাই। কিন্তুক যামু কোনদিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চলো যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না;— ও ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

— হ। ঠিক কথাই কইছ। কোনদিকে যাইবা কও— আইয়া তো পড়ল।

— এই দিকে।—

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চলো, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নীচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে পড়ে একেবরে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুইজনেই একবার থমকে দাঁড়াল— ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল— অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে, ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলভার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল। তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।

— কিনারে কিনারে চলো। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁয়ে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

— খাড়াও।— মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

— কী হইল?

— এদিকে আইয়ো— সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পান বিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

— হেদিকে দ্যাখো।

মাঝির সঙ্কেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কী যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নীচে ঘোড়ার জিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে— ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।— তবে?

— তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত্ যাইবা গা।

— আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।— আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

— আরে না-না মিয়া করো কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।— কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনাময় মাঝি গলা কাঁপে।

— ধইরো না, ভাই ; ছাইড়া দেও। বোঝো না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ দেখছে। কত আশা কইরা বইছে তারা নতুন জামা পিন্ব, বাপ্জানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই— পারুম না— মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

— যদি তোমারে ধইরা ফেলায়?— ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান উইঠো না। যাই...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।

— আদাব।

— আমিও ভুলুম না ভাই—আদব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুকধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হইতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগমান্—মাজি য্যান বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে আনন্দ করে পরবে। বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?'— সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

— হল্‌ট্...

ধ্বক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে।

— ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠিল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম, গুড়ুম। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

শব্দার্থ ও টীকা :

আদাব— অভিবাদন, সম্মাননীয়কে শ্রদ্ধা জানানো, সেলাম, নমস্কার। চোরাগোপ্তা— চোরের মত গুপ্তভাবে অতর্কিতে। উল্লাস— আনন্দ, স্ফুর্তি। সন্দিহান— সন্দেহজনক, সন্দেহযুক্ত। নির্জীব— মৃতকল্প ; জীবন নেই এমন। সেঁতাইয়া— স্যাঁতসেতে। মাই'র-দ'ইর— শব্দটি মারধর, আঞ্চলিক উচ্চারণে এরকম হয়েছে। জামা-পিন্‌ব— জামা পরবে। বাপজান— বাবা। আন্দাইরা— আঞ্চলিক উচ্চারণ। অন্ধকারে।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) আদাব গল্পের লেখক কে?

(খ) মাঝির বাড়ি কোথায় ছিল?

(গ) সুতাকলের কর্মীর বাড়ি কোথায় ছিল?

(ঘ) সুতাকলের কর্মী কোথায় কাজ করত?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) "পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ।" 'উভয়ে' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? কেন তারা পরিচয় দিচ্ছিল না।

(খ) "দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালোগোই।" বক্তা কে? লীগওয়ালোগোই বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

(গ) "তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?" কে কাকে এই কথা বলেছে?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) "যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।"
— কে, কাকে, কেন একথা বলেছিল?

(খ) "হ আমি মোসলমান।—কী হইছে?"— কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলেছে?

(গ) বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও মাঝি সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরে যেতে চেয়োছিল কেন? মাঝির পরিণতি কী হয়েছিল?

(ঘ) 'আদাব' গল্পের সারকথা লেখো।

পাঠবোধ :

'আদাব' গল্পটিতে আমরা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার চিত্র দেখতে পাই। যার উৎস ঘৃণা। কিন্তু এই গল্পে দেখা গেল দাঙ্গাই শেষ কথা নয়। ঘৃণা নয়, মানুষ শেষ পর্যন্ত ভরসা করে প্রেমে। তাই সুতাকলের কর্মী ও মাঝি দুজনই দুজনের প্রাণরক্ষায় তৎপর হয়েছিল।

ভাড়াটে চাই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে নাটক অন্যতম। উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠক্রমে সাহিত্যের সমস্ত প্রকরণের বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে এই নাটকটি অন্তর্ভুক্ত করা হলো। নাটক দৃশ্য কলা (performing art)। মঞ্চায়নেই তার পরম চরিতার্থতা। কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে নাট্য সাহিত্য বন্দিত হয়ে এসেছে। নিমগ্ন পাঠে রসিক পাঠক সাহিত্য রসের সন্ধান পান। নাটক তাই একাধারে কলা এবং সাহিত্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। তাঁর রচিত সাহিত্য সম্ভার আয়তনে বিপুল। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কিশোর সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি কয়েকটি নাটকও লিখেছেন। "ভাড়াটে চাই" তাঁর অন্যতম মঞ্চসফল নাটক। বর্ণনা নয়, একের পর এক সংলাপ সাজিয়ে কীভাবে এক একটি চরিত্রকে দৃশ্যমান করে তোলা যায় সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের একটি নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠবে এই নাটক পাঠের মাধ্যমে। এ ছাড়া কিশোর মনের সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করতেও সহায়ক হতে পারে এই নাটক। উৎসাহী ছাত্রেরা এ নাটকের মঞ্চায়নের আয়োজন করলে সে হবে উপরি-পাওনা।

লেখক-পরিচিতি :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার (বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলা) বালিয়াডাঙ্গিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস বরিশালের বাসুদেব পাড়া গ্রামে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষাজীবন কাটে দিনাজপুর, ফরিদপুর, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ

ও কলকাতায়। ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং ডক্টরেট ডিগ্রি নেন ১৯৬০ সালে। এরপর তিনি জলপাইগুড়ি কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছেলেবেলা থেকেই লেখালিখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় শিশু-মাসিকে। 'সন্দেশ', 'মুকুল', 'পাঠশালা', 'শুকতারা' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখেছেন। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় সুনন্দ ছদ্মনামে 'সুনন্দর জার্নাল' লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। বড়দের জন্য তিনি আনন্দবাজার, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি ও চতুরঙ্গে লেখালিখি করেন। 'শনিবারের চিঠি' সাময়িক পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তার সাহিত্য-জীবন শুরু হয় কাব্যচর্চা দিয়ে। পরে তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। বড়দের জন্য রচিত প্রথম প্রকাশিত 'উপনিবেশ', তিন খণ্ডে রচিত এই উপন্যাস ছাপা হয় মাসিক 'ভারতবর্ষ'-এ। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সংকলন 'বীতংস', 'দুঃশাসন', 'ভোগবতী' এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'শিলালিপি', 'লালমাটি', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'পদসঞ্চার'। 'সাহিত্যে ছোটগল্প' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ছোটদের জন্য তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র টেনিদা খুবই জনপ্রিয়। শিশুদের জন্যে অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর লেখা কিছু উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল— বৈতালিক, ইতিহাস, নক্রচরিত, হাড়, বীতংস, রেকর্ড, টোপ, আদাব ইত্যাদি। তাঁর চারটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'রামমোহন', 'ভাড়াটে চাই', 'আগন্তুক', 'পরের উপকার করিও না'। এ ছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত তাঁর গান চলচ্চিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর বাংলা সাহিত্যের অনন্য সাধারণ লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে।

মূলপাঠ :

(একটি মাঝারি সাইজের হল। ঘরটি নূতন চুনকাম করা হয়েছে। দু-তিনটে চেয়ার, একটি টেবিল— এ ছাড়া আর বিশেষ কোন আসবাবপত্র নেই। সকাল সাতটা। বাড়ীর মালিক ভূপেন তলাপাত্র এবং তাঁর দূর সম্পর্কের ভাইপো গাবলুর সঙ্গে কথা চলছে। গাবলুর হাতে দুটো খবরের কাগজ। ভূপেনের বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন, পাকা গোঁফ—ঝানু চেহারা। গাবলুর বয়েস বছর পঁচিশ—চোখেমুখে দুষ্টুমির ছাপ আছে।)

ভূপেন বিজ্ঞাপনটা ঠিক মতন বেরিয়েছে তো গাবলু? সব বেশ খোলসা করে লিখেছিস?

গাবলু সে আর বলতে হবে না কাকা। একেবারে জ্বালাময়ী ভাষায় লিখে দিয়েছি। "ভাড়াটে চাই। একখানি অতি মনোরম ঘর—পূব-দক্ষিণ দিয়া প্রচুর আলো-বাতাস আসে— ভাড়া অতি সুলভ। সত্বর খোঁজ করুন। বত্রিশের সাত পাঁচুরাম গোলদার লেন।"

ভূপেন অত লিখতে গেলি কেন? আবার বেশি পয়সা গেল একরাশ।

গাবলু আহা— তুমি বুঝছ না কাকা। বড় মাছ ধরতে হলে ভালো করে টোপ ফেলতে হবে না? কিন্তু— বলছিলুম কি— (ঘাড় চুলকোতে লাগল)

ভূপেন (বিরক্ত হয়ে)—আবার কী বলবি?

গাবলু বলছিলুম, কেন নীচের তলা ভাড়া দিয়ে আবার বাইবের লোক ডেকে আনছ? তোমার টাকার অভাব কী? জানো তো, পাড়ায় ভালো লাইব্রেরী নেই। ঘরটা যদি দিতে, একটা লাইব্রেরী হত—

ভূপেন (দাঁত খিঁচিয়ে) লাইব্রেরি। আহা-হা— শুনে একেবারে অঙ্গ জল হয়ে গেল আমার। বলি, অ্যাঁ— ওই সমস্ত ছাই ভস্ম বই পড়ে কার কী উব্‌গারটা হবে? খালি পাকামো শিখবি বই তো নয়। এই আমাকেই দ্যাখ্ না। পড়বার মধ্যে তো পড়ি খবরের কাগজে শেয়ারের দর। বাস— আর দেখতে হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাসে— (থমকে) থাক সে কথা— কোথায় ইনকাম ট্যাক্সের

লোক আবার থাবা পেতে আছে। হ্যাঁ— আর ওই তো তোদের হাবুল দত্ত। ফার্স্ট ক্লাস এম-এ, বই পড়ে চোখ প্রায় কানা— মাসে কত পায়। কুল্লে দেড়শো। লাইব্রেরি— ফুঃ।

গাবলু কিন্তু কাকা— লাইব্রেরী মানে জ্ঞান— মানে আলো—

ভূপেন থাম্— বকিসনি! তাহলে তো হাবুল দত্তের ঘরে পাঁচশো পাওয়ারের লাইট জ্বলত। দেখে আয় না— ইলেকট্রিকের বিল দিতে পারেনি বলে কানেকশন কেটে দিয়েছে। যাঃ এখন সরে পড় সামনে থেকে।

(বাইরে থেকে ডাক এল : "ভূপেনদা আছো— ও ভূপেনদা")

মরেছে! সকাল বেলায় আবার দাদা পাতাতে এলো কে? (সাড়া নিয়ে) আছি— ঢুকে পড়ো।

(রামরাম রাহার প্রবেশ। বয়েসে ভূপেনের মতোই হবেন। বেশ শৌখিন চেহারা— গিলে করা পাঞ্জাবী পরেন— গলায় চাদর— গোঁফটি সযত্নে দুপাশে পাকানো)

রামরাম তারপর ভূপেনদা— সব ভালো? তোমার গেঁটে বাত এখন একটু ভালো? সামনের দুটো দাঁত নড়বড় করছিল— সে দুটো তুলে ফেলেছ তো? তোমার অম্বলের ব্যারামটা এখন—

ভূপেন থামুন, থামুন রামরামবাবু— একটু দম ফেলতে দিন তো। চিরকাল তো 'আপনি' আর 'মশাই' দিয়ে চালালেন— হঠাৎ দাদা বুলি ধরছেন যে বড়? ব্যাপার কি?

রামরাম এত কাল অপরাধ করেছি ভূপেনদা—আজ সেটা টের পেলুম? হাজার হোক একটা মান্যিগণ্যি লোক—পাড়ার মাথা—জ্ঞানে বুদ্ধিতে—

গাবলু রূপে গুণে—

রামরাম হ্যাঁ—হ্যাঁ—রূপে গুণে, শৌর্যে, বীর্যে অদ্বিতীয় পুরুষ। শুধু দাদা কেন, ওঁকে তো—

গাবলু ঠাকুর্দা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ভূপেন চুপ কর বাঁদর কোথাকার, বেশি ওস্তাদি করিসনি। তা দেখুন রামরামবাবু, আপনাকে তো আমার হাড়ে হাড়ে চেনা আছে মশাই।

অকারণে এতখানি মধুবৃষ্টি করবেন, সে পাত্র তো আপনি নন। মতলবটা কী খুলে বলুন দিকি?

রামরাম ছিঃ—ছিঃ, মতলব আবার কী থাকবে? পাড়া-প্রতিবেশী—একটু খবর নিতে আসা—এই মাত্তর। তা বলছিলুম কি—আপনার এই ঘরটাই তো আপনি ভাড়া দেবেন?

ভূপেন দেব বই কি? সেইজন্যেই তো বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

রামরাম তাই এলুম।

ভূপেন আঃ।

রামরাম না-না ইয়ে—ঠিক তা নয়। ভাবলুম—মানে, দাদা হচ্ছেন পাড়ার মাথা—একবার সকালে খবরটা নিয়ে যাই—মানে অম্বলের ব্যারামটা কেমন আছে দেখে আসি। আর বলছিলুম কি—মানে—

ভূপেন অত আর মানে মানে করতে হবে না। ভাড়া নিতে চান—এই তো? সোজা বললেই হয়।

রামরাম হেঁ—হেঁ—দাদার যেমন কথা। দাদা হলেন পাড়ার মাথা—আমাদের অভিভাবক—তাই ভাবছিলুম, উনি কি আর আমাদের কাছে ভাড়া চাইবেন? মানে, আমরা দশজন মিলে সন্ধ্যের দিকে একটু বসব, একটুখানি তাস পাশা খেলা হবে—মানে, এক-আধটু গল্প গুজব—

ভূপেন বটে!

রামরাম দেখছো তো দাদা দিনকাল! মানে, রকে বসে নিশ্চিন্তে একটু গল্প গুজব করবারও জো নেই—সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গুণ্ডা আইনের হুড়ো লাগাবে। তা একটু বসবার জায়গা যদি পাই—মানে, একটু তাস-টাস—

গাবলু খাসা আইডিয়া—কাকা! লাইব্রেরী তো করতে দিলে না—এবার পাড়ার অকর্মাদের এনে তাসের আড্ডা বসিয়ে দাও।

ভূপেন চোপ্! (চটে) কুঁড়ের বাথান শিবের মন্দির পেয়েছেন—তাই নয়? সরে পড়ুন তো মশাই।

রামরাম আমায় বলছ দাদা?

ভূপেন খুব হয়েছে—আর দাদাগিরিতে কাজ নেই! যান—যান—আমার আর সময় নষ্ট করবেন না!

রামরাম কী? পাড়ার লোক আমরা—আমাদের অপমান করলেন? ঠিক আছে মশাই! লোহা দিয়ে তো মাথা বাঁধিয়ে আসেননি—মরবেনই একদিন। তখন দেখব কে কাঁধ দেয়। হুঁ। (রেগে বেরিয়ে গেল)

ভূপেন কাঁধ দিয়েও তোমাদের দরকার নেই। তা হলে ভূত হয়ে এক একটার ঘাড় মটকাব আমি। অকর্মার ঢেঁকি সব। আমার বাড়িতে তাসের আড্ডা বসাতে এসেছেন। গাবলা—

গাবলু কী কাকা?

ভূপেন একটা কোঁত্কা রেখে দে হাতের কাছে। এলেই তাড়া করবি।

গাবলু কোঁত্কা কোথায় পাব কাকা? তোমার রূপো বাঁধানো ছড়িটা নিয়ে আসব?

ভূপেন খবরদার—খবরদার, ও ছড়িতে হাত দিবিনি। ওই তো তোর রোগা পটকা ডিগডিগে চেহারা—ফস করে কেউ কেড়ে নিলে দামী ছড়িটাই গেল।

(সাহেবী পোষাক পরা এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। রাশভারী চাল—মুখে চুরুট। সঙ্গে একটি পূর্ববঙ্গীয় চাকর, তাকে একটি উর্দি পরিয়ে এনেছেন—সেটা গায়ে ঢল ঢল করছে। ভদ্রলোকের নাম মিঃ গুপ্ত—চাকরের নাম কানাই।)

মিঃ গুপ্ত গুড মর্নিং।

গাবলু আজ্ঞে হ্যাঁ—গুড মর্নিং—

মিঃ গুপ্ত মে আই নো—মানে আমি কি জানতে পারি—হু ইজ মিস্টার টলাপাট্রো?

গাবলু আজ্ঞে স্যার—টলাপাট্রো তো কেউ নেই। তবে ইনি আমার কাকা—ভূপেন তলাপাত্র।

মিঃ গুপ্ত আপনিই? সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

(এগিয়ে গিয়ে ভূপেনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন)

ভূপেন উহু-হু—গেলুম, গেলুম—

মিঃ গুপ্ত আই অ্যাম সরি—মানে আমি দুঃখিত—এক্সট্রিমলি সরি—অত্যন্ত দুঃখিত—

ভূপেন দুঃখিত ! আপনি তো দুঃখিত হয়েই খালাস—ইদিকে বেতো হাতটা আমার গেল। উঃ—উঃ—

মিঃ গুপ্ত কুড্‌নট আন্ডারস্ট্যান্ড—বুঝতে পারিনি। এক্সকিউজ্ মী—মাপ করবেন। একটু আর্নিকা খেয়ে নেবেন—সেরে যাবে। তা—আর ইউ গোইং টু রেন্ট দিস রুম? মানে আপনি কি ঘর ভাড়া দেবেন?

গাবলু সেইজন্যেই তো পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

মিঃ গুপ্ত ও-কে ! ও-কে ! কি রে কানাই—এ ঘর চলবে?

কানাই আইজ্ঞা—তা ভালোই চলবো। (চারিদিকে দেখেশুনে) তবে আট-দশটা খোপ কইর‍্যা দ্যাওন লাগবো।

ভূপেন খোপ ! কিসের খোপ?

কানাই খোপ না হইলে একলগে কুকুরগুলান থাকবে কেমন কইর‍্যা। কামড়াকামড়ি কইর‍্যা কুরুক্ষেত্তর বাধাইয়া দিবো না? হঃ—কী যে কন্ !

গাবলু কুকুর? কুকুর কেন হে বাপু?

কানাই কুকুর না তো কি কর্তা থাকবেন নাকি এই ঘরে? হঃ ! কর্তা বালিগঞ্জে অত বড় বাড়ি—এই ঘরে মরতে আইবেন কোন্ দুঃখে হঃ কী যে কন্? হাসাইলেন মশয়, নিতান্তই হাসাইলেন।

ভূপেন সে কি ! কুকুর রাখবার জন্য ঘর ভাড়া নিতে এসেছেন?

মিঃ গুপ্ত ক্যান্‌ট হেল্প, মানে উপায় নেই কিনা। আটটা কুকুর মশাই—দুটো গ্রেট ডেন, দুটো অ্যালসেসিয়ান, দুটো টেরি আর দুটো পিকিনিজ।

কানাই বুঝলেন—এই আটটায় মিল্যা যখন চিক্কের দিতে আরম্ভ করবো—তখন ট্যার পাইবেন—সুখ কারে কয় ! সেই জন্যেই তো মা-ঠাৈরেন, থুড়ি, মেম সাহেবের লগে বাবুর—থুড়ি, সাহেবের একেবারে রাম-রাবণের যুদ্ধ বাইধ্যা গেল। শ্যাষে মেম সাহেব একটা লঠি নিয়া সাহেবেরে...

মিঃ গুপ্ত আঃ—থাক থাক। মানে—দি পয়েন্ট ইজ—ইয়ে কথাটা হল—বাড়িতে একটু ডিস্টারবেন্স মানে গোলমাল হচ্ছে। তাই কুকুরগুলো এখানে থাকবে। একজন কীপার—মানে চাকরও থাকবে।

ভূপেন অ্যাঁ—কুকুরকে ঘর ভাড়া দিব !

কানাই আইজ্ঞা না—কর্তারে ! থুড়ি সাহেবেরে। কাইল যদিও মেম সাহেব সাহেবেরে কুকুর কইছেন—তাইলেও সাহেব কুকুর না—মানুষই।

মিঃ গুপ্ত আঃ—ইউ শাট আপ কানাই—তুই চুপ কর না। বলছিলুম কি—আই লাইক টু এনগেজ দিস রুম ফর মি—মানে আমি ভাড়া নেব। তাহলে আজ বিকেলেই—

ভূপেন মাপ করবেন—কুকুর-টুকুর আমি এখানে রাখতে দেবো না। আপনারা আসতে পারেন এখন। অ্যাঁ—বলে কি ! আটটা কুকুর ! কী ভয়ানক। কামড়ালেই তো জলাতঙ্ক।

গাবলু বড় লোকের কুকুর কাকা। দাঁতে অ্যান্টিসেপ্টিক দেওয়া আছে—কিছু হবে না।

ভূপেন বকিসনি ! না স্যার—মাপ করবেন, এখানে কুকুর-টুকুরের সুবিধে হবে না।

কানাই ভুল করতে আছেন মহাশয় মহা ভুল করতে আছেন। এই সব কি যা-তা কুকুর পাইছেন আপনি? হঃ—এরা রাস্তার নেড়ী কুত্তা না ! এদের জন্যই মাসে পাঁচশো টাকা খরচ হয়—সেইটা জানেন? পাইবেন তো শ্যাযে একটা কেরানী ভাড়াইট্যা। তার চাইয়া—

গাবলু কেন বকে মরছ বাপু। হবে না এখানে। তোমার সাহেব আর কুকুর নিয়ে আর কোথাও যাও—আমরা কোনো গরীব কেরানীকেই নয় ভাড়া দেব।

মিঃ গুপ্ত রট্ ! চল কানাই—

কানাই আইজ্ঞা, চলেন। ভুল করলেন—মশয়—মহা ভুল করলেন—। (দু'পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে) ভ্যাইবা দেখবেন ভালো কইর‍্যা—আমরা আবার আসব খন।

গাবলু আর আসতে হবে না—এতেই যথেষ্ট।

(মিস্টার গুপ্ত ও কানাইয়ের প্রস্থান)

ভূপেন কাণ্ডটা দেখছিস গাবলু? কী বেয়াক্কেলে লোক সব ! বলে কিনা—কুকুরের জন্যে ঘর ভাড়া নেবে। দুনিয়াটা দিনের পর দিন কী হচ্ছে বল্ দিকি?

গাবলু যাচ্ছেতাই কাকা, যাচ্ছেতাই। তবে কি জানো, নেহাত প্রাণের দায়েই এসেছে। এদিকে কুকুর পুষে সাহেবী করার শখ—ওদিকে গিন্নীর লাঠি—দিশেহারা হয়ে ছুটে এসেছিল। তোমার দয়া হওয়া উচিত ছিল কিন্তু।

ভূপেন দয়া ! আমার বেতো হাতটায় এমন ঝাঁকুনি দিয়েছে যে সারা শরীর ঝনঝন করছে এখনো। উঃ—খুনে লোক। গাবলু।

গাবলু কী বলছ?

ভূপেন দোকান থেকে চার আনার জিলিপি নিয়ে আয়। (একটা সিকি দিলেন) বড্ড খিদে পেয়েছে। (গাবলু যেতে উদ্যত) ফাউ চেয়ে আনিস—বুঝলি?

গাবলু চেষ্টা করব—(বেরিয়ে গেল)

ভূপেন কুকুরের জন্যে ঘর ভাড়া নেবেন। শখ কত। দুনিয়ার যে কত রকম মানুষ থাকে—আশ্চর্য ! (চারটি ছোকরার প্রবেশ। পরেশ, নরেশ, সিধু ও কালীপদ) আপনারা?

নরেশ আমরা হচ্ছি "মহিষমর্দিনী অপেরা পার্টি"।

ভূপেন মহিষমর্দিনী—কী বললেন?

নরেশ অপেরা পার্টি। মানে যাত্রার দল।

ভূপেন যাত্রার দল? তা এখানে কেন? আমি তো বায়না দিইনি?

সিধু বায়নার কথা হচ্ছে না। মানে আগে আমরা শোভাবাজারে ছিলুম—বাড়িওলা ইজেক্ট করেছে। তাই ভেবেছি এখানেই আস্তানা গাড়ব ! বেশ পছন্দ হচ্ছে জায়গাটা।

ভূপেন বলেন কি ! এখানে !

কালীপদ কেন—ভাড়া দেবেন—কাগজেই তো লিখেছেন। আমাদের দল মশাই—একেবারে সব সেরা দল। আমাদের 'কুম্ভকর্ণ বধ' পালা শুনে লোকে কেঁদে গড়াগড়ি দেয়। আজকাল আর একটা দল হয়েছে 'মহিষাসুর নাশিনী অপেরা'। খবরদার—ওদের পাত্তা দেবেন না। ওরা জাল—আমরা আসল।

ভূপেন আসল নকল বুঝিনে—যাত্রার দলকে আমি ঘর ভাড়া দেব না।

পরেশ দেবেন না মানে? মানে দলের খাতির কত জানেন? আমাদের এক একজনের কটা করে মেডেল আছে, সে খবর রাখেন?

নরেশ মুখে বললে বোধ হয় স্যারের পেত্যয় হবে না—একটু দেখিয়ে দিতে হচ্ছে। এই সিধে—এই কেলো—একটু লাগিয়ে দে তো। সেই "রাবণবিলাপ" পালায় রাবণ আর শূর্পনখার সীনটা?

সিধু লাগাবো? ঠিক আছে। কেলো—মোশান নে—
(কেলো মোশান নিয়ে দাঁড়াল। সিধু তার সামনে গিয়ে...)
দশানন,
লোকে বলে তোমা দিগ্বিজয়ী—
স্বর্গমর্ত্য-রসাতল তব ভয়ে কাঁপে থরথর।
তোমার ভগিনী আমি—পাষণ্ড রাঘব—
নাক-কান কাটি মোর করে অপমান।
অহো—অহো—উহু উহু—(কেঁদে ফেলল)
জ্বলিছে নাসিকা—জ্বলিতেছে কান
তারও চেয়ে বেশি জ্বলে অপমান হুতাশন শিখা—

কেলো ভগিনী—ভগিনী আমার—

ভূপেন আঃ, কী করছেন আপনারা?

নরেশ (ভূপেনের কাঁধে থাবড়া দিয়ে) চুপ করুন, ফিলিং নষ্ট করবেন না। বলে যা সিধে।

সিধু ডাকিয়ো না—ডাকিয়ো না মোরে।
হেন জ্বালা সহে না তো আর
ঝাঁপ দিব জলধির মাঝে
জুড়াইব প্রাণের আগুন—

কেলো স্থির হও—ধৈর্য ধরো ক্ষণকাল।
মহাবীর দশানন আমি।
চালাকি আমার সনে।
রাম-লক্ষ্মণেরে আনিব বাঁধিয়া—কাটিয়া-কুটিয়া
চচ্চড়ি-অম্বল-ঝোল রাঁধিব নিশ্চয়—

ভূপেন (চিৎকার করে) তারপর আপনারা এঘর থেকে যাবেন কিনা আমি জানতে চাই।

নরেশ আচ্ছা বেরসিক তো। ফিলিং নষ্ট করে দিচ্ছে।

পরেশ রিহার্সেলের সময় ডিসটার্ব করবেন না। বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

সিধু (সুর করে) তাই যাও সখা—
বধিয়ো না এমন ফিলিং—
মাটি হবে মুড। যাও বাহিরিয়া—

ভূপেন বটে! আমার ঘর থেকে আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াব! আচ্ছা— আমি পুলিসে খবর দিচ্ছি—

নরেশ অ্যাঁ—পুলিস?

সিধু (সুরে) সে তো ভাল কথা নহে সখা! পুলিশ বোঝে না রস— প্রেম নাহি প্রাণে।

পরেশ করহ প্রস্থান তবে।

কেলো নাঃ—লোকটা বড্ড বাজে অডিয়েন্স। সমস্ত ফিলিং একদম নষ্ট করে দিলে।

(দলটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। হঠাৎ নরেশ ফিরে দাঁড়ালো)

নরেশ আর মনে রাখবেন স্যার—আমাদের "মহিষমর্দিনী অপেরা পার্টিই হচ্ছে খাঁটি—আদি এবং অকৃত্রিম।" "মহিষাসুর নাশিনীদের" পাত্তা দেবেন না—ওরা জাল।

ভূপেন আচ্ছা আচ্ছা—খুব হয়েছে। আসুন আপনারা। (যাত্রার দল চলে গেল) বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে তো ভারী ফ্যাসাদে পড়া গেল। কেমন ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হয়েছে। যাত্রা পার্টি। কী জ্বালাতন! গাবলাটা আবার গেল কোথায়? জিলিপি আনতে গিয়ে বুড়ো হয়ে গেল নাকি?

(মুখে বিশৃঙ্খল দাড়ি—ছেঁড়া জামা—পাগলের প্রবেশ)

কে তুমি—কী চাও?

পাগল আমি কে? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমাকে চেনো না মহব্বৎ খাঁ?

ভূপেন মহব্বৎ খাঁ?

পাগল দাড়ি কামিয়েছ আর ফতুয়া পরেছ বলেই তোমায় চিনতে পারব না—তুমি কি আমায় এতই নির্বোধ পেয়েছো মহব্বৎ খাঁ? বেল্লিক,

তোমার এতবড় সাহস যে তুমি আমার সাধের তাজমহল ভাড়া দিতে চাও?

ভূপেন কী বিপদ! পাগল দেখছি যে!

পাগল চোপরাও বেতমিজ—এখনি তোমার গর্দান নেব। কার সঙ্গে কথা কইছ জানো? জানো—কে আমি? সারে হিন্দোস্তানের বাদশা শাহেনশা শাজাহান। দিন কতক আমি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে বেরিয়েছি—সেই ফাঁকে তুমি আমার এই সাধের তাজমহলে ভাড়াটে বসাতে চাও? ইল্‌হমদল্লাহ্!

ভূপেন আঃ—কী আপদ। যা—যা—রাস্তায় যা—

পাগল রাস্তায়? আমার এই তাজমহল ছেড়ে? ইন্‌সাল্লাহ্। বেওকুফ—এখনি তোমায় কোতল করে ফেলব। (চীৎকার করে) দেলোয়ার খাঁ—দেলোয়ার খাঁ—

(জিলিপির ঠোঙা হাতে গাবলুর প্রবেশ)

পাগল এই যে—এসেছো দেলোয়ার খাঁ? এই উজবুক মহব্বতের গর্দান নাও! এক্ষুনি। (গাবলু হাঁ করে রইল। পাগল হঠাৎ ছোঁ মেরে তার হাত থেকে জিলিপির ঠোঙা কেড়ে নিলে) কী এনেছো? রাজভোগ? আচ্ছা—আগে খেয়ে আসি—তারপর মহব্বতের বিচার করব!

(ঠোঙা থেকে জিলিপি খেতে খেতে প্রস্থান)

ভূপেন (আর্তনাদ করে) নিলে—নিলে! চার গণ্ডা পয়সার জিলিপি নিয়ে চলে গেল! ধর্—ধর্—

(গাবলু দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে উকি মেরে দেখল)

গাবলু ধরবার আর জো নেই কাকা—ট্রামে উঠে পড়েছে।

ভূপেন (ক্ষেপে গিয়ে) চার আনার জিলিপি কেড়ে নিয়ে গেল—আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি? অ্যা?

গাবলু দেখবার আর সময় পেলুম কই? ঘরে ঢুকতেই তো মহব্বৎ দেলোয়ার কী সব বলে-টলে খপ্ করে ঠোঙা কেড়ে নিল। কে ও, কাকা?

ভূপেন (দাঁত খিচিয়ে) সম্রাট শাজাহান।

গাবলু শাজাহান।

ভূপেন হাঁ, হাঁ—শাজাহান! তার তাজমহল ভাড়া দিচ্ছি—তাই গর্দান নিতে এসেছিল। সক্কালবেলাতেই ই কি পাগলের কাণ্ড রে! আমাকে সুদ্ধু পাগল করে দিয়ে গেল!

গাবলু আবার জিলিপি নিয়ে আসব কাকা?

ভূপেন থাক—ঢের হয়েছে—আর দরকার নেই। (তাকিয়ে) এরা আবার কারা?

(একটি দম্পতি প্রবেশ করলেন। দু'জনেই প্রৌঢ় বয়সের। স্বামীটি রোগা—গলায় তুলসীর মালা, গো-বেচারা টাইপ, স্ত্রীটি একটি জাঁদরেল গোছের)

আপনারা?

স্বামী নমো নারায়ণায়। অধমের নাম হচ্ছে সেবক্ কৃষ্ণদাস দাস। ইনি হচ্ছেন আমার সহধর্মিণী বৈষ্ণবী বিশাখা দাসী। আমরা আপনার ঘরটি ভাড়া নিতে এসেছি।

ভূপেন (খুশি হয়ে) বেশ, বেশ। বসুন।

কৃষ্ণদাস আজ্ঞে বসবার দরকার নেই—দাঁড়িয়েই কথাটা শেষ করি। বুঝলেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। ছেলেপুলে নেই। একটু শান্তিতে সাধন-ভজন করতে চাই। তাই আসা।

ভূপেন (আরো খুশি হয়ে) সে তো ভালো কথা—আমিও নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে চাই। ভাড়া কিন্তু চল্লিশ টাকা।

কৃষ্ণদাস তা হোক—তা হোক। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়—ব্যবসা-বাণিজ্য আছে—তেজারতি করে থাকি—আপনাকে ছ'মাসের ভাড়াই আগাম দেব। কথাটা কী জানেন—আমরা একটু শান্তিতে থাকতে চাই—আর কিছু নয়।

ভূপেন তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের এখানে কোন গোলমালই নেই! (গাবলুকে) ঘরটা এদেরই দেওয়া যাক—কী বলিস গাবলু?

গাবলু (মুখ ভার করে) তোমার ঘর—তুমি যা ইচ্ছা করো—আমার কী বলবার আছে?

ভূপেন কৃষ্ণদাসবাবু তা হলে সব দেখেশুনে নিন। ওপাশে কলঘর—ওদিকে ছোট বারান্দা—ওখানে রাঁধতে পারবেন—

কৃষ্ণদাস বাঃ—কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব তো ভালোই দেখছি। আমরা শান্তি চাই—এমনি একটি জায়গাই তো খুঁজছিলাম। ওগো—কী বলো—এতেই তো আমাদের কুলিয়ে যাবে?

বিশাখা (ভাঙা মোটা গলায়) কুলোতেই হবে। এর চাইতে বড় বাড়ি তো আর নেবে না তুমি—যা হাড় কেপ্পন।

কৃষ্ণদাস হেঁ হেঁ—বোঝো না—অপব্যয় কি ভালো? অল্পের মধ্যেই শান্তিতে থাকতে হয়। তা হলে—(জানলার কাছে গিয়ে) এখানেই আমাদের শোয়ার খাট পড়বে—

বিশাখা আ মরণ—কী বুদ্ধি! জানালার কাছে শোবো—আর রাত্তিরে চোরে আমার গয়না ধরে টান দিক। খাট থাকবে ও-পাশে।

কৃষ্ণদাস ও-পাশে। ওদিকে জানালা নেই যে। গরমে প্রাণ যাবে।

বিশাখা কী আমার শখের প্রাণ গড়ের মাঠ রে। একটু গরমে প্রাণ যাবে। না—খাট ওখানেই থাকবে।

কৃষ্ণদাস আমি বলি, খাট এদিকেই থাক!

বিশাখা খবরদার বলছি, (গলা চড়ল) খাট সরিয়েছ কি খুনোখুনি হয়ে যাবে।

ভূপেন আহা—হা—কেন আপনারা আগে থেকেই ঝামেলা করছেন? আগে সব ঠিক হোক—জিনিসপত্তর নিয়ে আসুন।

বিশাখা (প্রচণ্ড ধমক দিয়ে) তুমি চুপ করো তো বাপু। এমন বেয়াক্কেলে আহাম্মক লোক তো কখনো দেখিনি। সোয়ামী-ইস্ত্রী কথা কইছি—তার মধ্যে ফোড়ন কাটতে এসেছো।

ভূপেন ওরে বাবা।

গাবলু কাকা—থেমে যাও। ওরা স্বামী-স্ত্রী শান্তিপূর্ণ আলোচনা করছেন। তুমি আর ওর মধ্যে নাক গলাবার চেষ্টা করো না, তাতে নাক ভাঙতে পারে।

কৃষ্ণদাস আমার ইচ্ছা—খাট এখানেই থাকবে।

বিশাখা কক্ষনো না—খাট ওপাশে থাকবে।

কৃষ্ণদাস সাবধান বিশাখা—আমি তোমার স্বামী। পতি পরম গুরু। আমার মুখে মুখে তর্ক কোরো না—নরকে যাবে।

বিশাখা তবে রে হতচ্ছাড়া—তক্কো করবো না। ভেবেছো অন্যের বাড়িতে এসেছো—এখানে যা খুশি আমায় তাই বলতে পারবে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমায়। (গাছকোমর বাঁধতে বাঁধতে) ঝাড়ুন—একগাছা ঝাড়ুন পাই কোথায়? ওই তো কলতলায় মুড়ো ঝাঁটা একখানা আছে দেখছি—(রেগে বিশাখার অন্দরের দিকে প্রস্থান)

ভূপেন আহা—হা—একি করছেন !

গাবলু ওঁরা শান্তি চান কাকা—তারই মহড়া দিচ্ছেন।

(কৃষ্ণদাস এর মধ্যে সরে পড়েছেন)

বিশাখা (কলতলা থেকে) কই, কোথায় মুখপোড়া, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন—

গাবলু কাকা—পর্বতে বহ্নিমান ধূমাৎ—পালাও—

(গাবলু পালালো, ভূপেন পালাবার অন্য রাস্তা না পেয়ে চট করে টেবিলের তলায় ঢুকলেন)

বিশাখা (ঢুকে) কই—কোথায় গেল মড়িপোড়া মিন্‌সে? খাট কোথায় থাকবে দেখিয়ে দিচ্ছি এখুনি? গেল কোথায়? (টেবিলের তলায় ভূপেনকে দেখে) অ্যাঁ—ওখানে পালিয়েছ? ভেবেছো টেবিলের তলায় ঢুকে আমার হাত থেকে বাঁচবে? (কাছে গিয়ে ক ঘা বসিয়ে) এইবার? খাট কোথায় থাকবে? অ্যাঁঃ (আর এক ঘা বসিয়ে) বলি কোথায় থাকবে খাট?

ভূপেন ওরে বাপরে—গেলুম রে—থানা—পুলিশ—চৌকিদার—

বিশাখা চৌকিদার তোমায় দেখাচ্ছি। (আর এক ঘা) বলি, থাকবে কোথায়?

জবাব দাও—কোথায় থাকবে খাট?

ভূপেন বাপ-রে—মা-রে—গেছি-রে—ও মা-লক্ষ্মী—আমি নই—আমি নই—

(গাবলু দৌড়ে এল)

গাবলু ও কাকে মারছেন? (ইতিমধ্যে আর এক ঘা বসিয়েছেন বিশাখা)

আরে—উনি যে বাড়িওলা—আমার কাকা! আপনার সেবক কৃষ্ণদাস বাবু এখন সোজা বড় রাস্তা দিয়ে দৌড় মেরেছেন—

বিশাখা দৌড়ে যাবেন কোন চুলোয়? আমার খপ্পরেই পড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। দেখছি আমি খাট, কোথায় থাকে—(ছুটে বেরিয়ে গেল)।

ভূপেন (টেবিলের তলা থেকে) বাবারে, গেছিরে—হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে রে—

গাবলু বেরোও কাকা, নির্ভয়ে বেরিয়ে এসো এখন। অল ক্লিয়ার।

ভূপেন উহু-হু—আটকে গেছি যে। বেরুতে পারছি না। ওরে বাবারে—
(গাবলু টেনে ভূপেনকে বের করল)

গাবলু বড্ড লেগেছে কাকা? ডাক্তার ডাকব?

ভূপেন দরকার নেই—কাটা ঘায়ে তোকে আর নুনের ছিটে দিতে হবে না। উরিঃ বাব্বা—পিঠের আর কিছু রাখেনি। চিড়বিড় করে জ্বলছে। শান্তির সংসার—তাই বটে। নির্ঝঞ্ঝাট। ওফ্।

গাবলু ঝঞ্ঝাট নেই বলে যে ঝাঁটা থাকবে না—এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখা নেই কাকা।

ভূপেন তোকে আর রসিকতা করতে হবে না। ইদিকে আমার প্রাণ যায়। এক গ্লাস জল নিয়ে আয় দেখি চট্ করে।
(গাবলু জল আনতে গেল। ভূপেন উঃ—আঃ—বলে পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। খবরের কাগজ হাতে আর একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন)

ভদ্রলোক এ-ঘর ভাড়া দেওয়া হবে?

ভূপেন সে ইচ্ছে তো ছিল। তা আপনি—

ভদ্রলোক আমার কথা আর বলবেন না। মশাই। রবিবারের সকালে বাড়িতে বসে কোথায় নিশ্চিন্তে কয়েকটা ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল করব, তা এক দঙ্গল ছেলেপুলে সমানে চ্যাঁ-চ্যাঁ আর ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করছে। তার ঘরটা এখন খালি তো?
(গাবলু জলের গ্লাস নিয়ে এল। ভূপেন গ্লাসে চুমুক দিলেন। এর মধ্যে ভদ্রলোক চেয়ারে বসেছেন এবং টেবিলের ওপর কাগজখানা মেলে ধরে ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌লে মনোনিবেশ করেছেন)

গাবলু কাকা—ইনি?

ভূপেন ঘরভাড়া নিতে এসেছেন। তা ও মশাই—

ভদ্রলোক দাঁড়ান—কথা কইবেন না এখন। ভাবতে দিন। (একটা পেনসিল চুষতে লাগলেন।)

গাবলু এ আবার কী?

ভদ্রলোক কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। নেসেসারি ফর দি কানট্রি—কী হবে? এক্সপার্ট, না এক্সপোর্ট?

গাবলু ও মশাই—ও স্যার—

ভদ্রলোক কেন ডিস্টার্ব করছেন? দেখছেন না—ক্রশওয়ার্ড নিয়ে কেমন হিমশিম খাচ্ছি? এক্সপার্ট, না এক্সপোর্ট হবে? নাকি এক্সপ্লএট? তাও হতে পারে। দেশের জন্যে এক্সপ্লএট করবার লোকও তো দরকার। (পেনসিল চুষতে লাগলেন) একটা ডিক্সনারি নিয়ে আসুন তো। (গাবলুকে) চেম্বার্স। অক্সফোর্ড থাকলে তা-ও, যান না—

গাবলু ও কাকা—এ যে আবার ডিক্সনারি চাইছে।

ভূপেন আপনার মতলবটা কী মশাই? ঘর ভাড়া নেবেন সত্যিই?

ভদ্রলোক ভাড়া নিতে বয়ে গেছে আমার। খালি জায়গা পেয়ে একটু বসেছি—ক্রশওয়ার্ডটা ঠিক করে নিচ্ছি। তা আপনারা সমানে বকবক করছেন। কিন্তু এটা কী হবে? ডগ, না হগ। নাকি নগ। আচ্ছা—নগ শব্দের কি কোনো মানে হয়? কই মশাই—ডিক্সনারি কোথায়?

গাবলু ডিক্সনারির দরকার নেই—ওটা হবে লগ।

ভদ্রলোক অ্যাঁ—তা কী করে হয়। না-না, সে তো হতে পারে না।

গাবলু পারে—তাই হতে পারে। আপনি যদি দয়া করে গা না তোলেন—তাহলে লগ—মানে গদাই নিয়ে আসব।

ভদ্রলোক অ্যাঁ।

গাবলু হ্যাঁ। সাফ কথা।

ভদ্রলোক আচ্ছা ছোটলোক তো! একটু বসেছিলুম—তাও সইল না এদের। পৃথিবীতে কোথাও ভদ্রলোক নেই দেখছি। (বেরিয়ে গেলেন)

ভূপেন — বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়ে একি জ্বালাতনে পড়লুম রে গাবলা।

গাবলু — তাই তো বলছিলুম কাকা—ঘরটা আমাদের লাইব্রেরীকেই দান করে দাও। তোমার তো টাকার অভাব নেই। না হয় মাসে চল্লিশ টাকা ইন কাইণ্ড আমাদের ডোনেশান-ই দিলে। আমরাও অকৃতজ্ঞ নই। লাইব্রেরীর নাম দেব "ভূপেন্দ্র পাঠাগার"।

নন্তু — নিয়ে এসেছি।

সন্তু — খুব ভালো করে লিখিয়েছি কাকা। "ভূপেন্দ্র পাঠাগার"—(সন্তু হাতের শালুক মোড়ক খুলল—তাতে সত্যিই বড় বড় শাদা হরফে লেখা—"ভূপেন্দ্র পাঠাগার")

নন্তু — তাহলে এটা বাইরে টাঙিয়ে দিই—কী বলিস গাবলু?

ভূপেন — (চটে) বটে, মামাবাড়ির আবদার পেয়েছ—তাই না? আমি বেঁচে থাকতেই "ভূপেন্দ্র পাঠাগার"। লাইব্রেরী! নিকালো হিঁয়াসে—

সন্তু — আপনি বুঝতে পারছেন না কাকা। সত্যিই এতে পাড়ার ছেলেদের উপকার হবে। আমরা অনেকগুলো বইও যোগাড় করেছি—শুধু যদি আপনার ঘরটা পাই—

ভূপেন — দিচ্ছি ঘর! এ-সবই গাবলার কারসাজি। লাইব্রেরী করবে। (মুখ ভেঙ্চে) পিণ্ডির ব্যবস্থা হবে আমার।

নন্তু — কিন্তু কাকা—

ভূপেন — শাট আপ। ভাগো হিঁয়াসে। চালাকির আর জায়গা পাওনি।

(সন্তু-নন্তুর সভয়ে প্রস্থান)

খবরদার গাবলু। ফের যদি লাইব্রেরীর নাম করবি তো তোর কান উপড়ে নেব। মনে থাকে যেন আমার কথাটা।

(গাবলু গোঁজ হয়ে রইল। রামরাম রাহা আবার এসে উপস্থিত হলেন)

এই যে-ফের এসেছেন! আবার কি জন্যে—শুনি?

রামরাম — কী আর করি। দাদা হচ্ছেন পাড়ার মুরুব্বি—দাদার ওপর তো আর অভিমান করা যায় না। বলছিলুম কি, ঘরটা তাহলে আমাদেরই দিচ্ছেন? মানে সন্ধ্যেবেলায় সবাই একটু বসা, দু'হাত তাস-পাশ খেলা—

ভূপেন আপনি তে দেখছি ছিনে জোঁক মশাই। লজ্জা-সরমের বালাই নেই?

রামরাম শাস্ত্রেই তো আছে দাদা—ঘৃণা লজ্জা ভয়—তিন থাকতে নয়। আমার নিজের জন্য কি আর বলছি? এই পাড়ার দু'চারজন আসবে—একটু বসবে—

ভূপেন টেক কেয়ার রামবাবু, ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এর পরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেব।

রামরাম কী—ঘাড় ধাক্কা দেবেন? (রেগে তোতলা হয়ে গেলেন) বা-বা—বাড়িতে পেয়ে যা খু-খ-শি অপমান ক্-ক্-করলেন। যদি এর শ্-শ্ শোধ নিতে না পারি, তবে আ-আমার নাম রা-রা-রামরাম রা-রা-হাই-ই নয়।

(রেগে প্রস্থান)

ভূপেন ওরে গাবলা—কী ডেঞ্জারাস জীব! শাসিয়ে গেল। লোকটা যে এমন পাখোয়াজ সে তো জানতুম না।

গাবলু ঘরটা যদি লাইব্রেরীতে দিতে কাকা—তাহলে এসব পাখোয়াজ মৃদঙ্গের কোন ঝামেলাই হত না। তোমার জিলিপির ঠোঙা গেল—খামোকা ঝাঁটার ঘা খেলে—

ভূপেন চোপরাও। আমি ঝাঁটার ঘা খেয়েছি বলে তোর খুব ফুর্তি হয়েছে—না?

(শীলা, এলা, আইভির প্রবেশ)

শীলা নমস্কার। আমরা একবার ভূপেনবাবুর দেখা পেতে পারি কি?

ভূপেন আমিই ভূপেন। আপনাদের কী চাই, মা লক্ষ্মীরা?

এলা আপনার এই ঘরটি তো ভাড়া দেবেন? (চারিদিক দেখেশুনে) তা মন্দ হবে না—এতেই কুলিয়ে যাবে। বেশ লম্বা আছে ঘরটা।

ভূপেন ঘর ভাড়া নেবেন মা-লক্ষ্মী? তা আপনাদের সঙ্গে পুরুষ কই? কার সঙ্গে কথা কইব?

আইভি পুরুষদের দরকার কী—আমাদের সঙ্গেই কথা বলুন। আমরাই আমাদের গার্জেন।

ভূপেন অঃ।

শীলা — তা আগে পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমি হচ্ছি শীলা চক্রবর্তী—খুব ভালো জাপানিজ নাচ জানি। এই হল আইভি সেন—ওরিয়েন্টাল ড্যান্সে অমলাশঙ্করকেও হার মানায়। এ হচ্ছে এলা দত্ত—সমস্ত ফোক ডান্সে এক্সপার্ট—মণিপুরী থেকে শুরু করে রায়বেঁশে পর্যন্ত সব জানে।

ভূপেন — (ঘাবড়ে) অঃ। বেশ, বেশ !

শীলা — শুনুন, আমরা এখানে একটা নাচের ইস্কুল করব।

ভূপেন — নাচের ইস্কুল ! সে কি কথা ! নাচের আবার ইস্কুল কী ! না-না, এখানে ওসমস্ত হতে পারে না।

এলা — কেন পারে না—আলবৎ পারে। নাচের মতন কি জিনিস আছে? এক্সারসাইজ বলুন এক্সারসাইজ, এন্টারটেনমেন্ট বলুন এন্টারটেনমেন্ট—মানে এক কথায় নাচই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। তবে ভাড়া-টাড়া আমরা দিতে পারব না কিন্তু—

গাবলু — কাকা—নিশ্চিন্দি? এঁরা নাচের ইস্কুল করবেন, ভাড়াও দেবেন না।

ভূপেন — (ভয় পেয়ে)—না না—এখানে নয়, এখানে নয়। আপনারা আর কোথাও দেখুন।

আইভি — আর কোথায় দেখব—এই ঘরটাই আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাবনা কি—ভাড়া না পেলেও আপনি ঠকবেন না। আপনার মেয়েদের পাঠিয়ে দেবেন—ফ্রীতে নাচ শেখাব।

ভূপেন — মেয়ে-টেয়ে আমার নেই। আপনারা—

শীলা — মেয়ে না থাকে—আপনার স্ত্রীকেই শেখাব এখন।

গাবলু — কাকীমাকে নাচ শেখাতে গেলে আপনাদের আর একটু দূরে যেতে হচ্ছে। মানে তিনি ইহলোকে নেই কিনা। আপনাদের স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে।

এলা — বেশ তো, তা হলে ভূপেনবাবুই শিখবেন। (গাবলু হাঁ করল।)

ভূপেন — (বজ্রাহত) অ্যাঁ—আমি !

শীলা — ক্ষতি কি ! একটু বুড়ো—ভুঁড়িও আছে—তা হলেও বেশ নাচতে পারবেন। নাচের কি কোনো বয়েস আছে? এটা তো এক্সারসাইজ। ইউরোপে গিয়ে দেখুন—আশী বছরের বুড়োরাও দিব্যি রুম্বা—

ওয়াল্জ ফক্স-ট্রুট নাচছে। ওতে চমৎকার স্বাস্থ্য থাকে। আপনারও ভুঁড়ি কমে যাবে।

এলা এঁকে রায়বেঁশে শিখিয়ে দেব। বাঙালীর নিজস্ব নাচ। এখুনি একটু তালিম দিতে পারি। "আমরা নাচব রায়বেঁশে (সুরে)—মোদের ভাবনা ভয় কিসে—" এক-দুই তিন চার—দেখুন না—এমনি করে পা ফেলবেন—এক—দুই—তিন—

ভূপেন বাবারে গেছি—(আঁতকে পড়ে গেলেন)

এলা-শীলা-আইভি কী হল? কী হল? হঠাৎ পড়ে গেলেন কেন?

গাবলু ওর হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। আপনাদের নাচ শেখানোর প্রস্তাবেই—

এলা-শীলা-আইভি (সমস্বরে) অ্যাঁ—হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কী সাংঘাতিক।

(ওরা পালালো। ভূপেন মেজেতে পড়ে রইলেন কাঠ হয়ে)

গাবলু কাকা, উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ। তোমার পতন ও মূর্ছাটা খুব কাজ দিয়েছে।

ভূপেন ওফ্!

গাবলু (ভূপেনকে টেনে ওঠালো) উঠে পড়ো কাকা—ওঁরা চলে গেছেন। হাজার হোক মায়ের জাত তো, অল্পেই দয়া করেছেন।

ভূপেন একটা ফাঁড়া কাটলো রে গাবলা! এই বুড়ো বয়সে আমাকে নাচাতে এসেছে? আর একটু হলেই যে মহাপ্রাণটি বেরিয়ে যেত।

গাবলু সবে তো কলির সন্ধ্যে, কাকা! লাইব্রেরী যদি—সে কথা থাক্ কাকা। তুমি ভেতরে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে খানিকক্ষণ জিরোও গে। আমি ততক্ষণ এদিকটা সামলাই।

ভূপেন তা মন্দ বলিসনি আমার বুক ধড়ফড় করছে এখনো। কী ভয়ঙ্কর—এই বয়েসে আমাক নাচাতে চায়। ঘর ভাড়া দিতে গিয়ে খুব আক্কেল হয়েছে আমার। ওফ্ একটু চা খাইগে।

(ভূপেন ভেতরে গেলেন। গাবলু চেয়ারে বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটালো। দুটি লোক ঢুকলো। একজনের বগলে দাবার ছক।)

গাবলু কী চাই আপনাদের?

১নং দাবাড়ে এই ঘর ভাড়া হবে তো?

গাবলু আজ্ঞে হ্যাঁ।

২নং দাবাড়ে এখনো ভাড়া হয়নি?

গাবলু আজ্ঞে না।

১নং দাবাড়ে তাহলে নিশ্চিন্তে বসা যাক—কী বলো?

২নং দাবাড়ে হ্যাঁ—বসা যাক।

(বলেই মেজেতে দাবার ছক পেতে বসলেন দুজনে)

গাবলু একি করছেন আপনারা?

১নং দাবাড়ে খেলছি।

২নং দাবাড়ে (গুটি সাজাতে সাজাতে) কাল থেকে খেলাটা জমেছে মশাই—সারা রাত চলেছে—কেউই কাউকে মাৎ করতে পারিনি। বাড়িতে গিন্নিরা তাড়া লাগালে—ছক নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। পার্কে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে—কোথায় বসি? এতক্ষণে একটা ঠাঁই পাওয়া গেল। এই নাও গজ—(চাল দিলে)

গাবলু উঠুন, উঠুন—(কোনো সাড়া নেই—নিঃশব্দে খেলা চলতে লাগল) আঃ—শুনছেন—উঠুন, উঠে পড়ুন—

১নং দাবাড়ে চেঁচাবেন না—চাল নষ্ট হয়ে যাবে। এই মন্ত্রী দিলুম সামলাও—(চাল দিলে)

২নং দাবাড়ে তাই তো! আচ্ছা, এই আমার গজ—(ভাবতে লাগল)

গাবলু উঠুন—শিগগির উঠুন—(সাড়া নেই—দুজনে ভাবছেন) কই উঠলেন না? কী জ্বালা, কানে শুনতে পান না? ও মশাই—বলি ও মশাইরা—

১নং দাবাড়ে আঃ, চুপ করুন—চাল নষ্ট হয়ে যাবে! কি হে ঘোষাল—তোমার গজ যে গেল!

গাবলু (চীৎকার করে) আপনারা উঠবেন কিনা জানতে চাই। নইলে গায়ে কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেব বলছি।

২নং দাবাড়ে (মুখ তুলে) কাঁকড়া বিছে? কাদের কাঁকড়া বিছে? কোথায় থাকে?

গাবলু এই মরেছে! (আরো চেঁচিয়ে) পাহাড়ী—কাঁকড়া বিছে। কামড়ালেই মারা যাবেন। হাঁ-কাঁকড়া বিছে।

১নং দাবাড়ে (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)—অ্যাঁ—মারা যাব? খেলাটা শেষ না হতেই? সেটা তো ভালো হবে না। তবে ওঠো হে ঘোষাল। আর কোথাও দেখি।

২নং দাবাড়ে তাই চলো তবে। খেলাটা শেষ না করে মারা যাবার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু এই ছোকরাটা বড্ড বখাটে! বসতে দিলে না।

(দাবাড়েদের প্রস্থান। গাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল)

গাবলু কাকার আর কী দোষ—আমারই যে প্রায় মাথা খারাপের জো হয়েছে।

(নেপথ্যে থেকে ভৈরব কণ্ঠ : "ব্যোম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী")

—আরে—এ আবার কী।

(শিষ্য শ্যামাচরণ, বামাচরণ ও হরকালীকে নিয়ে স্বামী কালিকানন্দ প্রবেশ করলেন। স্বামীজীর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে গেরুয়া—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—কপালে ত্রিপুণ্ডক। বামাচরণের গলায় খোল—শ্যামাচরণের হাতে করতাল।)

কালিকানন্দ (মেঘমন্দ্রস্বর) বম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী—

শিষ্যরা (সমস্বরে) খাওয়ে পাঁঠা—বাজাওয়ে তালি।

গাবলু এ কী।

কালিকানন্দ বম্ কালী।

গাবলু তার মানে?

কালিকানন্দ ওহে শ্যামাচরণ—মানেটা বুঝিয়ে দাও।

শ্যামাচরণ মানে বোঝাবার আর কি আছে মোশাই? ইনি হচ্ছেন ১০৮ শ্রীমদ্ জগদ্গুরু কালিকানন্দ ভৈরব। এ ঘর খালি আছে—এখানে ওঁর আশ্রম হবে।

গাবলু ভাড়া কত দেবেন?

কালিকানন্দ ভাড়া! বম্ কালী! বামাচরণ—ভাড়ার কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

বামাচরণ ভাড়া! প্রভু কৃপা করে এখানে আশ্রয় করবেন, সেই তো ভাড়া। সেই ভাড়া নিয়েই তো আপনারা বৈতরণী পার হয়ে যাবেন। 'যমদ্বারে মহাঘোরে'—এক পয়সাও ফী দিতে হবে না।

গাবলু আজ্ঞে, মাপ করবেন প্রভু! আমরা তুচ্ছ মর্ত্যের জীব—ওসব পারমার্থিক ভাড়ায় আমাদের চলবে না। আমাদের নগদ টাকা চাই।

কালিকানন্দ বম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী। টাকা কী? টাকা মাটি—মাটি টাকা। রজত-কাঞ্চন ছুঁলেই অনন্ত নরক। সোজা রৌরব কুম্ভীপাকে ডুবে মরবি। একেবারে হাতে মুক্তির ফলটি এনে দেবো—খেলেই কৈলাসে চলে যাবি। হরকালী—

হরকালী (হাত জোড় করে) প্রভু—আদেশ করুন।

কালিকানন্দ এদের একবার কালীকীর্তন শুনিয়ে দাও। বুঝিয়ে দাও—

(শ্যামাচরণ, বামাচরণ, হরকালী)

(সমস্বরে) খাওয়ে পাঁঠা—বাজাওয়ে তালি—

কালিকানন্দ ধরো তাহলে—(বামাচরণ খোলে চাঁটি দিলে, শ্যামাচরণ করতাল শুরু করল। তারপর সমস্বরে তিনজনের গান। কালীকীর্তন—)

বম্ কালী, কলকাত্তাওয়ালী—
খাওয়ে পাঁঠা—বাজাওয়ে তালি!
ওরে ও বোকা মন—কালীর পায়ে দে রে তোর সকল ঢালি!
ওরে ও সংসারে কেই-বা কার
শুধু আঁটি চামড়া সার—
ওরে—ভবসিন্ধু তরিতে মন কালিকানন্দ আছেন খালি।
বম্ কালী—বম্ কালী—

(গাবলু গানের মাঝখানেই কান চেপে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। গান শেষ হতে দৌড়ে ফিরে এল।)

গাবলু প্রভু-প্রভু কালিকানন্দ—সর্বনাশ হয়েছে! রাস্তায় জোর দাঙ্গা বেধেছে—কালী-কীর্তন শুনে একদল আবার এদিকেই ছুটে আসছে।

কালিকানন্দ দাঙ্গা-মারামারি! কী বিপদ! এসব আবার কেন? এমন তো

কথা ছিল না! ওহে বামাচরণ—শ্যামাচরণ-হরকালী—এমতাবস্থায় কর্তব্য কী?

গাবলু দেরি করবেন না—প্রভু—কেটে পড়ুন। এখানে চেঁচামেচি শুনে লাঠি ছোরা নিয়ে সব পা বাড়িয়েছে। জানেনেই তো আজকালকার ব্যাপার—চারিদিকে গুণ্ডা—

শ্যামাচরণ তা আর বলতে! (ব্যস্ত হয়ে) প্রভু তা হলে—

কালিকানন্দ না—না স্থানত্যাগেন দুর্জন। চলো হে গাত্রোৎপাটনই করা যাক—

(সদলে প্রস্থান)

গাবলু (হাঁপাতে হাঁপাতে) যা হোক—বিদায় হয়েছে। যা কীর্তন ধরেছিল—আর একটু হলে আমারই দম ফেটে যেত। নাঃ—কাকার জন্য এখন আমার সহানুভূতি হচ্ছে। একটা ব্যবস্থা কিন্তু করতেই হয়। (খানিকটা পায়চারি করে) দি আইডিয়া। দেখি—(বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ ঘর খালি। তারপর রামরামের সঙ্গে ছ'সাতজনের একটি বিরাট দল প্রবেশ করল। প্রবীণ নিতাই গড়গড়ি—সঙ্গে দাশু, জনার্দন, কবি কৃপাসিন্ধু, সাঙ্গোপাঙ্গো। বিজয়, অজয়, সুজয় ইত্যাদি)

নিতাই এই ঘরেই?

রামরাম হাঁ, এখানেই তো ভালো। ঘর খালি আছে, ভাড়া দেওয়া হবে। আপনারা কোথাও জায়গা পাচ্ছেন না দেখে এখানে ডেকে আনলুম। ওহে দাশু, অজয়, বিজয়—চেয়ার-টেয়ারগুলো ঠিক করে দাও না। মীটিঙে দেরি করে লাভ কী?—

দাশু আজ্ঞে না—দেরি করে লাভ কী? এখানেই হোক। পার্কে তো এখন সব জায়গায় ইলেকশন মীটিং—'হলে' গেলে ভাড়া চায়। শোকসভাটা এখানেই হয়ে যাক।

রামরাম তা হলে আমি প্রস্তাব করি—স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর এই শোকসভায় প্রবীণ ব্যবসায়ী নিতাই গড়গড়ি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন। কই হে জনার্দন, সমর্থন কর।

জনার্দন হ্যাঁ—হ্যাঁ—ইয়ে—আমি সমর্থন করি।

বিজয় আপনি তবে আসন গ্রহণ করুন নিতাইদা!
(নিতাই গিয়ে চেয়ারে বসলেন, তারপর ওদিকে ওদিকে তাকালেন)

নিতাই কই হে—মালাটালা কোথায়? সভা করছ, অথচ সভাপতির জন্য একটা মালার ব্যবস্থা রাখোনি?

কৃপাসিন্ধু মালা একটা ছিল স্যার—গাঁদা ফুলের। রাস্তায় আসতে আসতে ষাঁড়ে খেয়ে নিল।

নিতাই (অসন্তুষ্ট হয়ে) টানাটানি করে রাখতে পারলে না। ছ্যা—এই জন্যেই তো তোমাদের কোনো কাজে আসতে ইচ্ছে করে না। তারপর কী প্রোগাম আছে—আরম্ভ করো।

জনার্দন (একটা কাগজ নিয়ে) প্রথমেই স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর অকালে পরলোকগমন উপলক্ষে একটি শোক-কবিতা পড়বেন কবি কৃপাসিন্ধু মজুমদার।
(সোনার চশমা পরা কৃপাসিন্ধু গিয়ে নিতাইয়ের পাশে দাঁড়াল; তারপর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কাব্যপাঠ আরম্ভ করল)

মাত্র নিরানব্বই বছর বয়সে
হে মহামানব ছিদাম চৌধুরী
তুমি পঞ্চত্ব পেলে।
যদিও পড়ে গিয়েছিল তোমার সব দাঁত—
মাথাজোড়া ছিল অতিকায় টাক—
যদিও তুমি চলতে ফিরতে কাঁপতে ঠক ঠক ঠক—
তবু অন্তরে অন্তরে ছিলে তুমি কচি ঘাসের মতন
কাঁচা তরুণ।
কোনো ছাগল মুড়িয়ে খেতে পারেনি তোমার হৃদয়ের সেই নীল ঘাস—
তাই ভূষিমালের ব্যবসায়
এক কোটি টাকা জমিয়ে ফেলছ!

তোমার শোকে আলুপোস্তার আলুতে পোকা ধরছে—
চিংড়িহাটার চিংড়ি পচে যাচ্ছে—
ট্যাংরার ট্যাংরা মাছ জালে উঠছে না!
শুধু চারিদিকে হাহাকার—
ছিদাম চৌধুরী—তুমি আর আমাদের মধ্যে নেই—
তুমি এখন মহাশূন্যে দড়িছেঁড়া বাছুরের মতো ছুটছ—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর—
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

জনার্দন (কাগজ পড়ে) এবার শ্রীযুক্ত বিজয় ঘোষ স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর পুণ্য চরিত শোনাবেন।

বিজয় (দাঁড়িয়ে উঠে) মাননীয় সভাপতি, সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, সরি—মহিলা কেউ নেই—মানে আজকের এই সভায় কী যে বলব জানি না। বলতে চোখ বাষ্পাবিল হচ্ছে—কণ্ঠ রুদ্ধ হচ্ছে, প্রাণ হাহাকার করছে, মাত্র নিরানব্বই বছর বয়সে ছিদাম চৌধুরী আমাদের ছেড়ে যে অনন্তধামে চলে গেলেন—
(ভূপেনের প্রবেশ)

ভূপেন অ্যাঁ—এ কী কাণ্ড! আমার ঘরে একদঙ্গল লোক কেন? ব্যাপার কী?

রামরাম ব্যাপার আবার কী? এরা স্বর্গীয় ছিদাম চৌধুরীর শোকসভা করবেন—জায়গা পাচ্ছিলেন না। তোমার ঘরটা খালি আছে দাদা—তাই এঁদের ডেকে আনলুম।

ভূপেন কী—আমার ঘরে বেআইনী জনতা! বিনা পার্মিশনে!

রামরাম চুপ—গোলমাল করবেন না। বলুন বিজয়বাবু—

বিজয় ছিদাম চৌধুরী অনন্তধামে চলে গেলেন। রেখে গেলেন অতুল কীর্তি তাঁর ভূষিমালের কারবার—এককোটি টাকার ব্যবসা—জাতির জীবনে অক্ষয় সম্পদ—আর কাঁদবার জন্য রেখে গেলেন আমাদের—(কোঁচায় চোখ মুছল)

ভূপেন গেট আউট—বেরোও সব এখান থেকে—পুলিশ ডাকব—

সুজয় (আস্তিন গুটিয়ে) শাট্ আপ্।

অন্যান্য সকলে শাট্ আপ্—শাট্ আপ্ !

ভূপেন (চিৎকার করে) মগের মুলুক পেয়েছ সব? জোর করে বেদখল ! গেট আউট—

দাশু ইউ গেট আউট—(ভূপেনকে ধাক্কা মারল)

ভূপেন খুন—খুন—ডাকাত—পুলিস—

নিতাই আঃ বড় গোল হচ্ছে সভায়—লোকটাকে রাস্তায় তাড়িয়ে দাও না !

অজয় তাই দিচ্ছি (অজয়, সুজয়, জনার্দন এসে ভূপেনকে টানতে লাগল) (ধাক্কাধাক্কি শুরু হল, চেঁচামেচি। সবাই মিলে ভূপেনকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল)

রামরাম কী দাদা—এখন কেমন লাগছে? তখন বললুম ঘরটা আমাদের দাও—ভালো কথা তো কানে নিলে না। বোঝো এবার—
(বলে খ্যাক খ্যাক করে হাসল। ভূপেন গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। ঠিক এই সময় দাড়িওলা এক লোক সুটকেস হাতে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে গাবলু।)

দাড়িওলা (ঢুকেই চিৎকার করে) সরে যান—আমায় একটু শুতে দিন কোথাও। আমার খুব জ্বর, আর দাঁড়াতে পারছি না।
(যারা ভূপেনকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা ছেড়ে দিলে। ভূপেন ধপাস করে পড়লেন। পড়েই রইলেন।)

নিতাই কে আপনি? জ্বর হয়েছে তো এখানে কেন? হাসপাতালে যান।

দাড়িওলা আমি গৌহাটি থেকে আসছি। ওখানে প্লেগ লেগেছে বলে পালিয়ে এসেছি—বগলে খুব ব্যথা। সুটকেসের ভেতরে একটা মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে—হোটেলে ছিলুম—সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। সরুন-সরুন শিগগির—শুতে দিন আমাকে—ভারী জ্বর এসেছে—সরুন, নইলে যেখানে সেখানেই ধপাৎ করে শুয়ে পড়ব কিন্তু—

রামরাম অ্যাঁ—জ্বর—গায়ে ব্যথা।

অজয় গৌহাটি থেকে আসছে !

জনার্দন সুটকেসে মরা ইঁদুর?

কৃপাসিন্ধু প্লেগ ! কী ভয়ানক ! আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। হেথা নয়— অন্য কোথা—অন্য কোনখানে—(পলায়ন)

নিতাই অ্যাঁ, বুড়ো বয়সে প্লেগে মারা যাব।

দাড়িওলা সরুন সরুন—কারো গায়েই শুয়ে পড়ব এখুনি—

বিজয় অ্যাঁঃ—এ যে গায়ে শুয়ে পড়তে চায়। না মশাই আর দেরি নয়—

দাশু বিলক্ষণ—আর দেরি করতে আছে?

(ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই ছুটল। নিতাই গড়গড়ি চেয়ারের ওপর চাদর ফেলেই দৌড়লেন—পালাতে গিয়ে ধড়াস করে একটা আছাড় খেলেন রামরাম—আধ মিনিটের মধ্যেই ঘর সাফ। ভূপেন কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন।)

ভূপেন হায়—হায়—আমার কি হল ! শেষে আমার ঘরে এসে প্লেগের রুগী ঢুকল। এবার যে সবংশে মারা যাব ! হায়—হায়—হায়—

গাবলু (কাছে এসে) কোনো ভয় নেই কাকা—ও প্লেগের রুগী নয়। নন্তু।

ভূপেন অ্যাঁ—নন্তু !

নন্তু (একটানে দাড়ি খুলে ফেলল) কী করব কাকাবাবু, এই নইলে আপনাকে যে বাঁচানো যেত না। এ ঘরে যে শোকসভা জমিয়েছিল, তাতে আর একটু হলে আপনার জন্যেই আমাদের শোকসভা করতে হত।

(সন্তু এসে ঢুকল)

ভূপেন বাঁচালে বাবারা—আমায় বাঁচালে। কিন্তু ওই সুটকেসে—

সন্তু প্লেগের ইঁদুর নেই কাকা। কী আছে—দেখবেন?

(সুটকেস খুলল। বেরিয়ে এল সেই শালুটি—ভূপেন্দ্র পাঠাগার)

গাবলু কাকা—তাহলে এটা—

ভূপেন টাঙিয়ে দে—দরজার সামনে টাঙিয়ে দে।—আর তলায় লিখে দে—ঘর ভাড়া হইয়া গিয়াছে।

নন্তু-সন্তু (আনন্দে) কাকা !

ভূপেন বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়ে খুব শিক্ষে হয়েছে আমার। ঝাঁটার ঘা থেকে শুরু করে কিছুই তো আর বাকী রইল না। তোদের লাইব্রেরিই হোক। সেইটেই দেখছি সবচেয়ে নিরাপদ।

গাবলু থ্রী, চিয়ার্স ফর ভূপেন কাকা—
নন্তু-সন্তু হিপ্ হিপ্ হুররে—

শব্দার্থ ও টীকা :

হুড়ো— তাগাদা, ধাক্কা। কোঁতকা— মোটা লাঠি বা লগুড়। জলাতঙ্ক— এক ধরনের রোগ, Hydrophobia। এই রোগে রোগী জল দেখলে ভয় পান। সাধারণত শেয়াল, কুকুর কামড়ালে এই রোগ হয়। তেজারতি— সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা। ক্রশওয়ার্ড পাজল— শব্দ মেলানোর খেলা। সূত্র অনুসারে খালি ঘরে বর্ণ সাজাতে হয় এই খেলায়। পাশাপাশি ও উপরনীচে শব্দসূত্র মেলানোর এই খেলায় অনেক অজানা শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ছিনে জোঁক— একটি বিশেষ প্রজাতির জোঁক, নাছোড়বান্দা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পাখোয়াজ— ঢোলের মতো দেখতে চামড়ামোড়া একটি বাদ্যযন্ত্র, মন্দার্থে ওস্তাদ, দুষ্ট ব্যক্তি। এই পাঠে শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রায়বেঁশে— বাংলার লোকায়ত নৃত্য। রায়বাঁশ বলতে বাঁশের বড় লাঠিকে বোঝায়। এইরকম লাঠি সহযোগে নাচের নাম রায়বেঁশে। ত্রিপুণ্ডক— কপালে তিনটি রেখাবিশিষ্ট তিলক। মগের মুলুক— অরাজক দেশ।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১)

(ক) ভূপেনবাবুর ভাইপোর নাম কী?

(খ) রামরামবাবুর পদবি কী?

(গ) মিঃ গুপ্তের চাকরের নাম কী?

(ঘ) যাত্রার দলের লোকেরা কোন পালার অংশ অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন?

(ঙ) কৃষ্ণদাস দাস কিসের ব্যবসা করতেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩)

(ক) গাবলুর দুজন বন্ধুর নাম লেখো।

(খ) নাচের স্কুল খোলার উদ্দেশ্যে কারা ঘর ভাড়া চাইতে এসেছিলেন?

(গ) ঘর ভাড়া চাইতে আসা চারজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করো।

(ঘ) ভূপেনবাবুর ঘরে কার শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল? সেই সভায় কে কবিতা পাঠ করেছিলেন?

(ঙ) কে "দাড়িওলা" সেজেছিল এবং কেন?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫)

(ক) ভূপেনবাবুর ঘরটি গাবলু ও তার বন্ধুরা কোন কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল? তাদের ইচ্ছা কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল?

(খ) কৃষ্ণদাস দাস ও বিশাখা দাসীর হাতে ভূপেনবাবুর হেনস্থার বিবরণ দাও।

(গ) পাগল চরিত্র আলোচনা করো।

(ঘ) নাচের স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ভূপেনবাবুর অভিজ্ঞতা সরল ভাষায় বর্ণনা করো।

(ঙ) মিঃ গুপ্ত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর ভাড়া চাইতে এসেছিলেন? তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি কেন?

পাঠবোধ :

"ভাড়াটে চাই" নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। নাটকটির প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট। এই নাটকের মূল বিষয় অর্থাৎ ঘর ভাড়া দেওয়া ও নেওয়ার নানান জটিলতা দিনে দিনে বাড়বে বই কমবে না। বিষয়টি জটিল হলেও নাট্যকার সমস্ত বিষয়টি মুড়ে রেখেছেন হাস্যরসের আবরণে। স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন চরিত্রের আগমন ঘটেছে নাটকে। প্রত্যেকের একটা ভাড়া ঘর চাই। প্রত্যেকের প্রয়োজন আলাদা আলাদা। মালিক ভূপেনবাবু চান একজন নিরুপদ্রব ভাড়াটিয়া। এখান থেকেই নাটকের দ্বন্দ্ব দানা বাঁধতে শুরু করে। যাঁরা ঘর ভাড়া নিতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অদ্ভুত, চালচলন অদ্ভুত, কথাবার্তা অদ্ভুত; সবটাই ভূপেনবাবুর প্রত্যাশিত শান্তির বিপরীতে। নাজেহাল ভূপেনবাবু ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এক সময়। অন্যদিকে

ভাইপো গাবলু ও তার সঙ্গীরা ঘরটির দখল চায় লাইব্রেরি করার জন্য। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওদের ইচ্ছাকেই জিতিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর রচনার ভাণ্ডার বিপুল। তিনি শিশু কিশোরদের মনের হদিস জানতেন। ছয় দশক আগে একটা লাইব্রেরির যে প্রাসঙ্গিকতা ছিল তা আজও অক্ষত। ছাত্রছাত্রীদের সামনে এই বিষয়টি বিস্তৃত করা যেতে পারে। পাশাপাশি আন্তর্জালের সাহায্যে নাটকটির বিভিন্ন মঞ্চায়ন দেখাতে পারলে পাঠপর্ব মনোগ্রাহী হবে বইকি।

ব্যাকরণ

পদ-পরিবর্তন

প্রত্যয়

শব্দভাণ্ডার

অশুদ্ধি সংশোধন

কারক-বিভক্তি

পদ-পরিবর্তন

বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলা হয়। বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া নামে পাঁচ প্রকার পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে যে পদে কোনো কিছুর নাম বোঝানো হয়, তাকে বিশেষ্য বলা হয়। বিশেষ্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি যে পদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাকে বিশেষণ পদ বলা হয়। বিশেষ্যের পরিবর্তে বাক্যে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলা হয়। যে পদে কোনো ধরনের কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়া বলা হয়। এ ছাড়া বাক্যমধ্যে এমন কতোগুলো পদ পাওয়া যায়, যেগুলো লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তিযুক্ত হলেও, কোনো ধরনে পরিবর্তিত হয় না, এই পদগুলোকে অব্যয় পদ বলা হয়।

কখনো কখনো বিশেষ্য পদ বিশেষণে এবং বিশেষণ পদ বিশেষ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ধরণের এক শ্রেণির পদ থেকে অন্য এক শ্রেণিতে পদের পরিবর্তনকে 'পদ-পরিবর্তন' বলা হয়। এধরনের পরিবর্তনের উদাহরণ—

১. **বিশেষ্য থেকে বিশেষণ :**

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অন্তর	আন্তরিক	বৎসর	বাৎসরিক
ধাতু	ধাতব	অংশ	আংশিক

বিনয়	বিনয়ী/বিনীত	অভ্যাস	অভ্যস্ত
ভাত (খাদ্য)	ভেতো	গো	গব্য
অণু	আণব/আণবিক	কর্ম	কর্মী
অরণ্য	আরণ্যক	উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বসিত
ক্রোধ	ক্রুদ্ধ	তাপ	তপ্ত
ঋষি	আর্য	নীতি	নৈতিক
নুন	নোনা	পরাক্রম	পরাক্রান্ত
দাঁত	দাঁতালো/দেঁতো	পরিধান	পরিধেয়
পশু	পাশব/পাশবিক	নগর	নাগর/নাগরিক
নিশা	নৈশ	বন	বন্য
পতন	পতিত	দাস	দাসী
ত্রাস	ত্রস্ত	ফাঁক	ফাঁকা
মুখ	মুখর/মৌখিক	মোহ	মুগ্ধ/মূঢ়
সূর্য	সৌর	লোক	লৌকিক

২. **বিশেষণ থেকে বিশেষ্য :**

বিশেষণ	**বিশেষ্য**	**বিশেষণ**	**বিশেষ্য**
অধিক	আধিক্য	অনুগত	আনুগত্য
অসুস্থ	অসুস্থতা	আসক্ত	আসক্তি
উচিত	ঔচিত্য	উজ্জ্বল	উজ্জ্বলতা/ঔজ্জ্বল্য
উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ	উচ্চ	উচ্চতা
এক	একতা/ঐক্য	কঠিন	কঠিনতা/কাঠিন্য
করুণ	করুণা/কারুণ্য	কর্তা	কর্তৃত্ব
কিশোর	কৈশোর	কৃপণ	কৃপণতা/কার্পণ্য
গম্ভীর	গাম্ভীর্য/গম্ভীরতা	গিন্নি	গিন্নিপনা
গুরু	গুরুতা/গুরুত্ব	চালাক	চালাকি

তৎপর	তৎপরতা/তাৎপর্য	তরুণ	তারুণ্য
দক্ষিণ	দাক্ষিণ্য	দীন	দীনতা/দৈন্য
ধূর্ত	ধূর্ততা/ধূর্তামি	বীর্যবান	বীর্যবত্তা
নিপুণ	নিপুণতা/নৈপুণ্য	নিরাশ	নৈরাশ্য/নিরাশা
নীল	নীলিমা	ঠাকুর	ঠাকুরালি
বাবু	বাবুয়ানা/বাবুগিরি	বীর	বীরত্ব/বীর্য

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (মূল্যাঙ্ক : ১) :

ক) বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পদ পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দাও।

খ) বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পদপরিবর্তনের একটি উদাহরণ দাও।

গ) বৎসর / বাৎসরিক : পদ পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয় করো।

ঘ) সূর্য / সৌর : পদ পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয় করো।

ঙ) অনুগত / আনুগত্য : পদ পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয় করো।

চ) পদ পরিবর্তন করো : পরাক্রম, দাস, নিরাশ, বীর, নীল।

ছ) সঠিক পদ-পরিবর্তনটি নির্ণয় করো :

বিনয় / বিনয়পূর্বক, সবিনয়, বিনীত

অধিক / অধিকতর, অধিকতম, অধিকারী, আধিক্য

চালাক / চালু, চালাক-চতুর, চালিকা, চালাকি

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (মূল্যাঙ্ক : ২/৩) :

ক) পদ কাকে বলে? বাংলায় কয় প্রকার পদ পাওয়া যায়?

খ) বিশেষ্য পদ কাকে বলে? বিশেষ্য পদের দুটি উদাহরণ দাও।

গ) বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদের দুটি উদাহরণ দাও।

ঘ) সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদের যে কোনো দুটি উদাহরণ দাও।

ঙ) ক্রিয়াপদ কাকে বলে? ক্রিয়াপদের যে কোনো দুটি উদাহরণ দাও।

চ) অব্যয় পদ কাকে বলে? অব্যয় পদের যে কোনো দুটি উদাহরণ দাও।

ছ) পদ-পরিবর্তন কাকে বলে?

জ) বাংলায় পদ পরিবর্তনের দুটি প্রকারভেদের নাম উল্লেখ করো।

ঝ) বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পদ পরিবর্তনের দুটি উদাহরণ দাও।

ঞ) বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পদ পরিবর্তনের দুটি উদাহরণ দাও।

ট) পদ-পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয় করো : (যে কোনো দুটি)

অন্তর > আন্তরিক ; লোক > লৌকিক

করুণ > করুণা ; গিন্নি > গিন্নিপনা

৩। উত্তর দাও (মূল্যাঙ্ক : ৪/৫) :

ক) পদ-পরিবর্তন কাকে বলে? উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

প্রত্যয়

শব্দ বা ধাতু থেকে নতুন শব্দ বা ধাতু নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে সেই মূল শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে বিশেষ কতোগুলো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত করা হয়। এই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকেই প্রত্যয় বলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, মূল শব্দ বা ধাতুতে যা যোগ করলে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে প্রত্যয় বলা হয়। যেমন, 'হাত' একটি শব্দ, এর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'হাতা' শব্দ উৎপন্ন হয়। 'চল্' একটি ধাতু, এর সঙ্গে 'অন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'চলন' শব্দ গঠিত হয়।

প্রত্যয় দুই প্রকার—(১) কৃৎ প্রত্যয় এবং (২) তদ্ধিত প্রত্যয়। ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, 'খেল্' ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হলে 'খেলা' শব্দ গঠিত হয়। এই 'খেলা' শব্দটি একটি বিশেষ্য পদ বা নাম শব্দ। এক্ষেত্রে 'খেল্' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত 'আ' প্রত্যয়টি হল 'কৃৎ প্রত্যয়'। এভাবেই, 'পেট' শব্দের সঙ্গে 'উক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পেটুক' শব্দ উৎপন্ন হলে, 'উক' প্রত্যয়টি হয় 'তদ্ধিত প্রত্যয়'।

শব্দ গঠনের দিক থেকে শব্দকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়— (১) মৌলিক শব্দ এবং (২) সাধিত শব্দ। এর মধ্যে যে শব্দগুলোকে ভেঙে বা বিশ্লেষণ করে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ বলা হয়। যেমন—হাত, পা, কান, মা, ভাই, মাছ ইত্যাদি। আবার, যে শব্দগুলোকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় এবং সেই ভাঙা অংশের মূল পর্ব থেকে তার অর্থও বোঝা যায়, তাকে সাধিত শব্দ বলা হয়। প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ বা ধাতু থেকে যেসব শব্দ উৎপন্ন হয়, সেগুলো সবই সাধিত শব্দের অন্তর্গত। প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দকে 'প্রত্যয়নিষ্পন্ন' শব্দ বলা হয়।

ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে সব শব্দ গঠিত হয়, তাকে 'কৃদন্ত শব্দ' বলা হয় এবং বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি নাম পদের পর তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত করে যেসব শব্দ গঠন করা হয়, সেগুলোকে 'তদ্ধিতান্ত শব্দ' বলা হয়। যেমন, 'শুন্' ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে গঠিত 'শোনা' শব্দটি কৃদন্ত শব্দ এবং 'নীল' শব্দের সঙ্গে 'ইমা' প্রত্যয় যোগে গঠিত 'নীলিমা' শব্দটি তদ্ধিতান্ত শব্দ।

১. **কৃৎ প্রত্যয় :** বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয় দুই প্রকারের—সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় এবং বাংলা কৃৎ প্রত্যয়। এর মধ্যে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় কেবল সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গেই যুক্ত হয়। তবে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বাংলা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন, 'কৃষক' শব্দে সংস্কৃত ধাতু 'কৃষ'-এর সঙ্গে যুক্ত 'নক' প্রত্যয়। বাংলা ধাতুর সঙ্গে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় যোগের উদাহরণ—লড়্ + আই = লড়াই।

১.১ **সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় :** বাংলায় প্রচলিত অনেক তৎসম শব্দ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ। সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যোগে এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। বাংলার প্রচলিত এধরনের সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ—

১.১. **ক) —অক (— ণক) :** ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কর্তৃবাচক নাম শব্দ উৎপন্ন করে। যেমন ✓নী + -অক = নায়ক; ✓গৈ + ণক গায়ক, ✓দৃশ্ + ণক = দর্শক; ✓পচ্ + ণক = পাচক।

১.১ **খ) —অন (—অনট) :** ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক, ভাববাচক, বস্তুবাচক ইত্যাদি বিশেষ্য পদ গঠন করা হয়। যেমন—✓গম + -অন = গমন, ✓ভুজ + -অন্ = ভোজন; ✓স্মৃ + -অন = স্মরণ, ✓জ্ঞা + -অন = জ্ঞান, ✓নী + -অন = নয়ন।

১.১ **গ) —অনীয় (অনীয়র্) :** ধাতুর পর এই প্রত্যয় যোগে 'যোগ্য' বা 'কর্তব্য' অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। যেমন—✓পা + -অনীয় = পানীয়, ✓দৃশ্ + -অনীয় = দর্শনীয়।

১.১ **ঘ) —ইষ্ণু :** কয়েকটি ধাতুর পর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্বভাব বা অভ্যাস নির্দেশক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—✓সহ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু, ✓বৃঠ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু, ✓ক্ষি + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু।

১.১ **ঙ) —ত (ক্ত) :** সংস্কৃত ধাতুর পর এই প্রত্যয় যুক্ত করে অতীত কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ শব্দ গঠন করা হয়। যেমন—

✓ধৃ + -ত(ক্ত) = ধৃত, ✓কৃ + (ক্ত) = কৃত; ✓মুহ্ + -ত = মুগ্ধ; ✓দুহ্ + -ত = দুগ্ধ; ✓গম্ + (ক্ত) -ত = গত; ✓রক্ষ্ + (-ত) = রক্ষিত; ✓ভী + ক্ত = ভীত; ✓পত্ + ক্ত = পতিত।

১.১ **চ) — তব্য (—তব্যৎ)** : ধাতুর পরে এই প্রত্যয়যুক্ত হয়ে 'কোনো কিছু করা উচিত' বা 'কোনো কিছু করা দরকার'—ধরনের অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠন করে। যেমন, ✓দা + -তব্য = দাতব্য; ✓কৃ + -তব্য = কর্তব্য; ✓মন্ + -তব্য = মন্তব্য; ✓গম্ + -তব্য = গন্তব্য; ✓দৃশ্ + -তব্য = দ্রষ্টব্য।

১.১ **ছ) -তি (-ক্তিন্)** : ধাতুর পরে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভাববাচক স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন—✓কৃ + -তি (ক্তিন্) = কৃতি; ✓ভজ্ + -তি (ক্তিন্) = ভক্তি; ✓মন্ + -তি (ক্তি) = মতি; ✓গম্ + -তি (ক্তি) = গতি।

১.১ **জ) -তৃ (-তৃচ্ -তৃন্)** : ধাতুর পরে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'যে করে' অর্থসূচক শব্দ গঠন করে। এই '-তৃ' পুংলিঙ্গ কর্তৃকারকের একবচনে '-তা' হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গে '-ত্রী' হয়। ক্লীব লিঙ্গ এবং সমাসের পূর্বপদে '-তৃ' রূপটি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন,— ✓কৃ + -তৃ = কর্তৃ - কর্তা (পুং), কর্ত্রী (স্ত্রী), কর্তৃ (ক্লীব), এবং সমাসে কর্তৃকারক, কর্তৃপক্ষ, কর্তৃবাচ্য।

✓নী + র্তৃ (নেতৃ) = নেতা (পুং) নেত্রী (স্ত্রী)।

অভি ✓-নী + -র্তৃ = অভিনেতা (পুং), অভিনেত্রী (স্ত্রী)।

১.১. **ঝ) -মান (-শানচ্)** : ধাতুর পর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ পদ গঠিত হয়। এর উদাহরণ—

ভাস্ + (শানচ্ =) -মান = ভাসমান; ✓বৃৎ + -মান = বর্তমান;

✓বিদ্ + -মান = বিদ্যমান; ✓মৃ + -মান = ম্রিয়মান;

✓দৃশ্ + -মান = দৃশ্যমান; সম্ -✓চর + -মান = সঞ্চরমান।

১.১ **ঞ) -য (= -য়) (-য্যৎ; শ্যৎ; ক্যপ্)** : ধাতুর সঙ্গে সংস্কৃতের এই তিনটি প্রত্যয়যুক্ত হয়ে 'করা উচিত' বা 'করা যায়' অর্থনির্দেশক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন—✓লভ্ + -য = লভ্য; ✓সহ্ + -য = সহ্য; ✓কৃ + -য = কার্য; বি - ধা + য = বিধেয়।

১.২ বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

১.২. **ক) -অ (-ও), -উ** : বাংলা ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সম্ভাব্যতা, আসন্নতা, ঈষদ্ভাব বা 'প্রায় এরূপ' ধরনের অর্থ প্রকাশক বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। সাধারণত এধরনের শব্দের দ্বিত্ব হয়। যেমন—

✓কাঁদ + (-অ) = কাঁদো (কাঁদো-কাঁদো), ✓উড়্ + -উ = উড়-উড়,

✓ডুব্ + (-অ) = ডুবো (ডুবো জাহাজ), ✓ডুব্ + -উ = ডুবু (ডুবু-ডুবু)।

১.২ **খ) -অত/-অতা (-তা), -অতি (-তি)** : ধাতুর পর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন,—✓মান্ + -অত = মানত; ✓বস্ + -অতি = বসতি; ✓কাট্ + -তি = কাটতি; ✓চল্ + -তি = চলতি।

১.২. **গ) -অন** : ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয়ের যোগে ক্রিয়াবাচক ও বস্তুবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করা হয়। যেমন,—✓চল্ + -অন = চলন; ✓গড়্ + অন = গড়ন; ✓বাঁচ্ + -অন = বাঁচন; ঝাড়্ + -অন = ঝাড়ন।

১.২ **ঘ) -অনি (-উনি)** > **-'নি'** : একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই প্রত্যয় বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন,—কাঁদ্ -অনি কাঁদনি/কাঁদুনি, নাচ্ + উনি = নাচুনি; কাঁপ্ + উনি = কাঁপনি/কাঁপুনি।

১.২ **ঙ) -অন্ত** : ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। যেমন,—চল্ + -অন্ত = চলন্ত; বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত; ছুট্ + অন্ত = ছুটন্ত।

১.২ (চ) - আ, (ওআ — ওয়া) : এই প্রত্যয় ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও বস্তুবাচক বিশেষ্য নির্দেশক শব্দ গঠন করে। যেমন—

(i) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : √বল্ + আ = বলা, √ছাড় + আ = ছাড়া, √কাচ্ + আ = কাচা, √দেখ্ + আ = দেখা

(ii) ক্রিয়াবাচক বিশেষণ : মর্ + আ = মরা (মরা ইঁদুর)

(iii) বস্তুবাচক বিশেষ্য : √তুল্ — তুলা — তোলা

১.২ (ছ) আই : একাক্ষর ধাতুর পর এই প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করা হয়। তেমন, — √যাচ্ + আই = যাচাই,

√বাঁধ্ আই = বাঁধাই, √লড়্ + আই = লড়াই।

১.২ (জ) -আন্, (-অন্) -আনো : ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠন করে। তেমন, √জানা + আন্, -আনো = জানান, জানানো : √চালা + -আন, আনো = চালান, চালানো।

১.২ (ঝ) -উক (-উকা) : ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয়টি যুক্ত হয়ে স্বভাব নির্দেশক শব্দ গঠন করে। তেমন, √মিশ্ + -উক = মিশুক, √খা + উকা = খাউকা, খেকো

১.২ (ঞ) -আনি,/-উনি : ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন,— √শুনা + -আনি = শুনানি, √ধম্কা + -আনি = ধমকানি; √বিনা + -আনি, -উনি = বিনানি, বিনুনি, √উড়া + -আনি, -উনি = উড়ানি, উড়ুনি।

২. তদ্ধিত প্রত্যয় : কৃৎ প্রত্যয়ের মতো বাংলাভাষায় প্রচলিত তদ্ধিত প্রত্যয় দুই শ্রেণিতে বিভক্ত— (১) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় এবং (২) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়।

২.১ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় : বাংলায় প্রচলিত প্রচুর তৎসম শব্দ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত তদ্ধিতান্ত শব্দ। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত প্রত্যয়ের যোগে এই শব্দগুলো গঠিত হয়েছে। বাংলায় প্রচলিত এধরনের সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ—

২.১. (ক) -অ (-অন্, = অঞ, ণ) : বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের পর এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যেমন, কশ্যপ + -অ = কাশ্যপ, রঘু + অ = রাঘব; শিব + অ = শৈব; তিল + -অ = তৈল, পৃথিবী + অ = পার্থিব, শিশু + -অ = শৈশব।

২.১. (ক) -আয়ন (ষ্ণায়ন) : বিশেষ্য শব্দের পর 'অপত্য' অর্থে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যেমন— নর + -আয়ন = নারায়ণ, শকট + আয়ন = শকটায়ন।

২.১. (গ) - ই (ষ্ণি) : এই প্রত্যয়ও বিশেষ্য পদের পর 'অপত্য' অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন—

দশরথ + ই = দাশরথি, পর্বত + ই = পার্বতী, রাবণ + ই(ষ্ণি) = রাবণি।

২.১. (ঘ) -ইক (ষ্ণিক) : বিশেষ্য শব্দের পর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'তৎ সম্বন্ধীয়' অর্থ-নির্দেশক শব্দ গঠন করে। যেমন—

তর্ক + -ইক = তার্কিক; ন্যায় + -ইক = নৈয়ায়িক

পুরাণ + ইক = পৌরাণিক, ধর্ম + ইক = ধার্মিক

২.১. (ঙ) ইত (-ইতচ্) : বিশেষ্য শব্দের পর এই প্রত্যয় যোগে 'জাত' অর্থসূচক বিশেষণ পদ গঠন করা হয়। যেমন—

পল্লব + ইত = পল্লবিত, ক্ষুধা + ইত = ক্ষুধিত।

২.১. (চ) -ইন, বিন : অস্তি অর্থে বিশেষ্য শব্দের পর এই প্রত্যয়যুক্ত হয়, যেমন—

পক্ষ + -ইন = পক্ষিন, পক্ষী (পুং), পক্ষিণী (স্ত্রী)

কর্ + ইন = করী (পুং) করিণী (স্ত্রী)।

২.১. (ছ) -ইমা (-ইমন) : বিশেষণ শব্দের পর ভাবার্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ গঠন করে। যেমন— নীল + -ইমা = নীলিমা, গুরু + -ইমা = গরিমা।

২.১. (জ) -ইল, -ল : বিশেষ্য শব্দের পর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'এটা আছে' অর্থ প্রকাশ করে। যেমন,

পঙ্ক + -ইল = পঙ্কিল, পিচ্ছা + -ইল = পিচ্ছিল,

ফেন + -ইল = ফেনিল, জটা + -ইল = জটিল,

মাংস + -ল = মাংসল, শীত + -ল = শীতল।

২.১. (ঝ) ঈয় (ষ্ণীয়) : বিশেষ্য শব্দের পর 'তত্র জাত', 'তদ্‌বিষয়ক' ইত্যাদি অর্থে এই প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যেমন—

দেশ + -ঈয় = দেশীয়, ভারত + ঈয় = ভারতীয়,

ধর্ম + ঈয় = ধর্মীয়, বায়ু + ঈয় = বায়বীয়,

জল + ঈয় = জলীয়, স্ব + ঈয় = স্বীয়।

২.১. (ঞ) ঈয়স, —তর, ইষ্ঠ, —তম : তুলনামূলক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়গুলো প্রযুক্ত হয়। যেমন—

গুরু + ঈয়স = গরীয়স্ — গরীয়ান্ (পুং), গরীয়সী (স্ত্রী)

গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ (পুং)

প্রিয় + ঈয়স = প্রেয়স্— প্রেয় ঃ (ক্লীব), প্রেয়সী (স্ত্রী)।

২.২. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় : বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় আবার তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী নামে তিনটি বিভাগে বিভক্ত।

২.২.১. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (তৎসম) : এই বিভাগের কয়েকটি প্রত্যয়ের পরিচয়—

(ক) ইমা : চাঁদ + ইমা = চাঁদিমা, বঙ্ক + ইমা = বঙ্কিমা,
লাল + ইমা = লালিমা, কাল + ইমা = কালিমা

(খ) ঈয় : বিদেশী নামের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যেমন—
মিশর + ঈয় = মিশরীয়, ইতালি + ঈয় = ইতালীয়

২.২.১. (গ) উক :

পেট + উক = পেটুক, হিংসা + উক = হিংসুক

লাজ + উক = লাজুক, মিশ + উক = মিশুক

(ঘ) ত্ব :

নতুন + ত্ব = নতুনত্ব, হিন্দু + ত্ব = হিন্দুত্ব

গুরু + ত্ব = গুরুত্ব;

(ঙ) ময় :

জল + ময় = জলময়; কাদা + ময় = কাদাময়,

দেশ + ময় = দেশময়; ইউরোপ + ময় = ইউরোপময়

(চ) সহ :

ঢাকি + সহ = ঢাকিসহ; কাপড় + সহ = কাপড়সহ,

বাছুর + সহ = বাছুরসহ

(ছ) শুদ্ধ :

দেশ + শুদ্ধ = দেশশুদ্ধ, মাল + শুদ্ধ = মালশুদ্ধ

২.২.২. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (তদ্ভব) : এই বিভাগের কয়েকটি প্রত্যয়ের পরিচয়—

(ক) আ :

গোদ + আ = গোদা,চাল + আ = চালা,

তেল + আ = তেলা, রোগ + আ = রোগা,

বাঘ + আ = বাঘা, হাত + আ = হাতা।

(খ) আই :

চোর + আই = চোরাই, বামন + আই = বামনাই,

মিঠা + আই = মিঠাই, সাফ + আই = সাফাই,

রাম + আই = রামাই,কান + আই = কানাই।

(গ) আইত, আত :

সঙ্গ + আত = সাঙ্গাৎ, সেবা + আইত = সেবাইত,

রাম + আইত = রামাইত, পোয়া + আত = পোয়াতি (স্ত্রী)

(ঘ) আচ, আচি :

কান + আচ = কানাচ, ঘাম + আচি = ঘামাচি

(ঙ) আন, আনো :

জুতা + আন, আনো = জুতান, জুতানো,

যোগ + আন = যোগান, হাত + আনো = হাতানো।

(চ) আনি :

নাক + আনি = নাকানি,

চোখ + আনি = চোখানি।

(ছ) আম, আজি :

ঠক + আম = ঠকাম, পাকা + আম, আমি = পাকাম, পাকামি,

ন্যাকা + মি = ন্যাকামি, কুঁড়ে + মি = কুঁড়েমি।

(জ) ই, ঈ :

পণ্ডিত + ই = পণ্ডিতি, মাস্টার + ই = মাস্টারি,

(ঝ) ইয়া, -এ :

পাড়াগাঁ + ইয়া = পাড়াগাঁইয়া — পাড়াগেঁয়ে

উত্তর + ইয়া = উত্তরিয়া — উত্তুরে

(ঞ) উ :

খোকা + উ = খুকু, নীচ + উ = নীচু,

দুষ্ট + উ = দুষ্টু, ঢাল + উ = ঢালু।

(ট) ক, কা, কী, কীয়া, কে, কা :

ঢোল + ক = ঢোলক; দোল + ক = দোলক,

দম + কা = দমকা; বড় + কা = বড়কা।

(ঠ) গোছ — গোছের :

লম্বা + গোছ = লম্বাগোছ

ভদ্র + গোছ = ভদ্রগোছ।

(ড) ট :

দাপ + ট = দাপট; সাপ + ট = সাপট;

ঝাপ + ট = ঝাপট, জমা + ট = জমাট।

(ঢ) পনা, পানা :

গৃহিণী + পনা = গৃহিণীপনা, দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা

ন্যাকা + পনা = ন্যাকাপনা, চাঁদ + পানা = চাঁদপানা।

(ণ) সই :

জল + সই = জলসই,

রুল + সই = রুলসই।

২.২.৩. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (বিদেশী) : এই বিভাগের কয়েকটি প্রত্যয়ের পরিচয়—

(ক) আন/ওয়ান = গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান, দার + ওয়ান = দারোয়ান

(খ) আনা (আনি) :

বাবু + আনা = বাবুয়ানা, (বাবুয়ানি),

হিন্দু + আনি = হিন্দুয়ানি,

মুন্সি + আনা = মুন্সিয়ানা।

(গ) খানা :

ছাপা + খানা = ছাপাখানা, বৈঠক + খানা = বৈঠকখানা

জেল + খানা = জেলখানা, ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা

(ঘ) খোর :

আফিম + খোর = আফিমখোর, ঘুষ + খোর = ঘুষখোর

(ঙ) গিরি :

বাবু + গিরি = বাবুগিরি, কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি

গুন্ডা + গিরি = গুন্ডাগিরি, গুরু + গিরি = গুরুগিরি

(চ) দান, দানি :

কলম + দান, দানি = কলমদান, কলমদানি,

পিক + দানি = পিকদানি, বাতি + দান = বাতিদান

(ছ) নবিশ :

পত্র + নবিশ = পত্রনবিশ, নকল + নবিশ = নকল নবিশ।

(জ) বাজ, বাজি :

ধোঁকা + বাজ, বাজি = ধোঁকাবাজ, ধোঁকাবাজি,

দাঙ্গা + বাজ = দাঙ্গাবাজ, গলা + বাজি = গলাবাজি।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (মূল্যাংক : ১) :

(ক) প্রত্যয় কয় প্রকার?

(খ) মৌলিক শব্দের একটি উদাহরণ দাও।

(গ) সাধিত শব্দের একটি উদাহরণ দাও।

(ঘ) কৃদন্ত শব্দের একটি উদাহরণ দাও।

(ঙ) তদ্ধিতান্ত শব্দের একটি উদাহরণ দাও।

(চ) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় কয়টি?

(ছ) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় কয়টি।

(জ) √পত + ক্ত = পতিত; কোন ধরনের প্রত্যয়ের উদাহরণ।

(ঝ) লাল + ইমা = _____ প্রত্যয়ান্ত শব্দটি লেখো।

(ঞ) ধর্ম + _____ = ধার্মিক, শূন্যস্থানে সঠিক প্রত্যয়টি প্রয়োগ করো।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (মূল্যাংক : ২/৩) :

(ক) কৃৎ প্রত্যয়ের দুটি উদাহরণ দাও।

(খ) তদ্ধিত প্রত্যয়ের দুটি উদাহরণ দাও।

(গ) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় কয় প্রকার ও কী কী?

(ঘ) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় কয় প্রকার ও কী কী?

(ঙ) প্রত্যয় নির্ণয় করো :

ভদ্র + গোছ = ভদ্রগোছ; √সহ + য = সহ্য

৩। উত্তর দাও (মূল্যাংক : ৪/৫) :

(ক) বাংলায় প্রচলিত কৃৎ প্রত্যয়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্বন্ধে উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

(খ) বাংলায় প্রচলিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্বন্ধে উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

(গ) টীকা লেখো :

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়, বাংলা কৃৎ প্রত্যয়, সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়, বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, বাংলার বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়।

শব্দভাণ্ডার

কোনো একটি ভাষার ব্যবহৃত শব্দাবলিকে 'শব্দভাণ্ডার' বলা হয়। শব্দ-ভাণ্ডারই হল ভাষার মূল সম্পদ ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। ব্যাকরণের আলোচনায় তাই শব্দভাণ্ডারের অধ্যয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, শব্দভাণ্ডারের অধ্যয়নে সাধারণত সেই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎসগত শ্রেণি বিভাগ নির্দেশ করা হয় এবং শব্দসম্পদের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়।

বাংলা ভাষায় আমরা যে সব শব্দ ব্যবহার করি, সেগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে বাংলায় গৃহীত হয়েছে। এই উৎসগুলোকে নির্দেশ করে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। সুবিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এধরনের সাতটি বিভাগের উল্লেখ করেছেন, এবং বিভাগগুলো হল— (১) তৎসম, (২) তদ্ভব, (৩) অর্ধ-তৎসম, (৪) দেশী, (৫) বিদেশী, (৬) বাংলা ভিন্ন ভারতীয় শব্দ এবং (৭) সংকর শব্দ। তবে এক্ষেত্রে আরেক ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন বাংলা শব্দভাণ্ডারকে প্রধানত (১) মৌলিক এবং (২) আগন্তুক নামে মাত্র দুটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মৌলিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে আগত বা গৃহীত শব্দাবলি। এই শব্দগুলো আবার (ক) তদ্ভব, (খ) তৎসম এবং (গ) অর্ধ-তৎসম উপবিভাগে বিভক্ত। তিনি আগন্তুক শব্দগুলোকেও আবার 'দেশি' ও 'বিদেশি' নামে দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে 'দেশি' শব্দগুলো এসেছে ভারতবর্ষেরই প্রাচীন অধিবাসী অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি ভাষা থেকে এবং 'বিদেশি' শব্দগুলো এসেছে আরবি-ফারসি, পোর্তুগিজ-ফরাসি ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে।

বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করলেও মোটামুটিভাবে বাংলা শব্দের প্রধান প্রধান শ্রেণিবিভাগ হল—

১। মৌলিক শব্দ : মৌলিক শব্দগুলোই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাংলাভাষার নিজস্ব শব্দ। এই বিভাগের তিনটি উপবিভাগ— তৎসম, তদ্ভব এবং অর্ধ-তৎসম— এর নামকরণের ক্ষেত্রে যে 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, সেই 'তৎ' শব্দে মূল আর্যভাষা

বা সংস্কৃত ভাষাকে সূচিত করা হয়। সেই সূত্রে 'তৎসম' শব্দের অর্থ হয়ে ওঠে মূল আর্যভাষার অপরিবর্তিত শব্দাবলি, 'তদ্ভব' শব্দে সেই মূলভাষা থেকে জাত বা উদ্ভূত শব্দাবলিকে নির্দেশ করা হয়, এবং 'অর্ধ-তৎসম' অর্থে কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত বা বিকৃত মূলভাষার শব্দাবলিকে চিহ্নিত করা হয়।

১. (ক) তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ মূল আর্য ভাষা বা সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অপরিবর্তিত বা অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে, সেই শব্দগুলোকে তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন— আকাশ, বায়ু, জল, মানুষ, কৃষ্ণ, অন্ন, নদী, নারী, কেশ, লতা, দেহ, জীবন, মৃত্যু, সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, মিত্র, সুন্দর ইত্যাদি।

১. (খ) অর্ধ-তৎসম শব্দ : যে শব্দগুলো একসময়ে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, সেই শব্দগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন— 'কৃষ্ণ' পরিবর্তিত হয়ে 'কেষ্ট'তে পরিণত হয়েছিল। এধরনের আরো শব্দের উদাহরণ— বৈদ্য>বদ্দি; রাতি>রাত্তির; নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন, পুরোহিত>পুরুত; যজ্ঞ>যজ্ঞি; শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ; গৃহিণী>গিন্নি; তৃষ্ণা>তেষ্টা; ক্ষুধা>খিদে ইত্যাদি।

১. (গ) তদ্ভব শব্দ : যে শব্দগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে/ভাষাতাত্ত্বিক নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেই শব্দগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। যেমন— মূল ভাষার 'হস্ত' মধ্যপর্বের ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনে 'হত্থ' হয়ে যায়, এবং সেই 'হত্থ' থেকে আবার পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় 'হাত' রূপে গৃহীত হয়। এধরনের আরো শব্দের উদাহরণ—

কর্ণ>কান; মৎস্য>মাছ; ব্যাঘ্র>বাঘ; চন্দ্র>চাঁদ; কুম্ভকার>কুমার; তৈল>তেল; পক্ষ>পাখা; অর্ধ>আধ; মিথ্যা>মিছা; স্বর্ণ>সোনা; তাম্র>তামা; পক্ষী>পাখি ইত্যাদি।

এই তদ্ভব শব্দগুলোকেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচনা করেন।

২। আগন্তুক শব্দ : মৌলিক শব্দাবলি ছাড়াও বাংলা ভাষায় যুগ যুগ ধরে অন্যান্য ভাষা থেকেও শব্দাবলি গৃহীত হয়েছিল। এভাবে অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দাবলিকে 'আগন্তুক শব্দ' নামে অধিহিত করা হয়।

২. (ক) দেশি শব্দ : আগন্তুক শব্দের 'দেশি শব্দ' উপবিভাগে সাধারণত আর্যমূলীয় অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ছাড়া দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ইত্যাদি ভাষাবংশ থেকে আগত শব্দাবলিকেই নির্দেশ করা হয়। বঙ্গদেশে আর্যভাষার আগমনের পর যেসব স্থানীয় অনার্য শব্দ বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেই শব্দগুলোকেই দেশি শব্দ বলা হয়।

যেমন— ঢোল, ডাব, ঝিঙ্গা, কুলা, ডিঙ্গি, ঝাঁটা, ঢিল, ঢেউ, ঢাল, ঝোল, ঢেঁকি, ডাঙ্গা ইত্যাদি।

২. (খ) বিদেশি শব্দ : বিদেশি ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেই শব্দগুলোকে 'বিদেশি শব্দ' বলা হয়। এই শব্দগুলোকেও তাদের মূলভাষার নামেই নামাঙ্কিত করা হয়। যেমন—

২.খ.১. ফারসি শব্দ— কামান, জাহাজ, পেয়ালা, নগদ, খরচ, কম, বেশি, বস্তা, সিন্দুক, খুব, জোর, রেশম ইত্যাদি।

২.খ.২. আরবি শব্দ— আইন, আক্কেল, আয়েশ, বিদায়, কেতাব, আতর, জিলা, কেচ্ছা, দফা, হুকা ইত্যাদি।

২.খ.৩. তুর্কি শব্দ— আলখাল্লা, গালিচা, চাকু, কুলি, বোঁচকা, দারোগা, বাহাদুর, বিবি, বেগম, উজবুক ইত্যাদি।

২.খ.৪. পোর্তুগিজ শব্দ— আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, নোনা, আতা, বালতি, কামিজ, কেরানি, চাবি, সাবান, তোয়ালে, পেরেক, ফিতা ইত্যাদি।

২.খ.৫. ওলন্দাজ শব্দ— হরতন, রুইতন, ইস্কাবন, তুরুপ, ইসক্রুপ ইত্যাদি।

২.খ.৬. ফরাসি শব্দ— কার্তুজ, কুপন ইত্যাদি।

২.খ.৭. ইতালি শব্দ— কোম্পানি, গেজেট ইত্যাদি।

২. খ. ৮. রাশিয়ান শব্দ— বলশেভিক, সোভিয়েত ইত্যাদি।

২.খ.৯. জাপানি শব্দ— হারাকিরি, রিক্শা।

২.খ.১০. চীনা শব্দ— চা, চিনি ইত্যাদি।

২.খ.১১. বর্মি শব্দ— ঘুগনি, লুঙ্গি, ফুঙ্গি ইত্যাদি।

২.খ.১২. ইংরেজি শব্দ— বঙ্গদেশে ইংরেজি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়। বর্তমানকালে

প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে। বাংলাভাষার এই ইংরেজি শব্দাবলিকে প্রধানত দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম বিভাগে ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় গৃহীত সামান্য পরিবর্তিত শব্দাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই শ্রেণির শব্দাবলি ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন— লর্ড > লাট; কর্ড > কার; বক্স > বাক্স বা বাস্ক; ল্যাম্প > লম্প; গ্লাস > গেলাস; সেন্ট্রি > সান্ত্রী; গার্ড > গারদ; ল্যান্টার্ন > লণ্ঠন ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে যে সব ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোর উচ্চারণ মোটমুটি অবিকৃত রয়েছে। এই শব্দগুলোকে ইংরেজি থেকে আগত শব্দের দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন— শার্ট, কোর্ট, ট্রেন, কোট, প্যান্ট, সিনেমা, থিয়েটার, ফোটো, ফোন, কলেজ ইত্যাদি।

এ ছাড়া ইংরেজি শব্দের প্রভাবে অনেক শব্দ বাংলায় অনুবাদ করে গ্রহণ করা হয়েছে। এধরনের শব্দকে বলা হয়— 'অনুবাদ ঋণ'। বাংলা শব্দভাণ্ডারের এধরনের শব্দের উদাহরণ—

University > বিশ্ববিদ্যালয়; Golden opportunity > সুবর্ণ সুযোগ; Wrist Watch > হাতঘড়ি; Necktie > গলাবন্ধ; Textbook > পাঠ্য পুস্তক; Subjectmatter > বিষয়বস্তু; Light House > বাতিঘর; Golden age > স্বর্ণযুগ; Motherland > মাতৃভূমি ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (মূল্যাঙ্ক : ১) :

(ক) ভাষার মূল সম্পদ কী?

(খ) মৌলিক শব্দকে কয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়?

(গ) আগন্তুক শব্দকে কয়টি বিভাগে বিভক্ত করা যায়?

(ঘ) তৎসম শব্দের একটি উদাহরণ দাও?

(ঙ) কোনটি অর্ধ তৎসম শব্দ, তা নির্ণয় করো : কর্ণ, রাত্তির, ঢেঁকি।

(চ) 'কেরানি' শব্দটি কোন শ্রেণির শব্দ? 'কেরানি' শব্দটি কোন বিদেশি ভাষা থেকে আগত?

(ছ) গ্লাস > গেলাস— কোন শ্রেণির শব্দের উদাহরণ?

(জ) জাপানি ভাষা থেকে আগত যে কোনো একটি শব্দের উদাহরণ দাও?

(ঝ) Golden age > স্বর্ণযুগ— কোন শ্রেণির শব্দের উদাহরণ?

(ঞ) ঢোল, ঢেউ, কুলা— এধরেনের শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন শ্রেণির অন্তর্গত?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (মূল্যাঙ্ক : ২/৩) :

(ক) শব্দভাণ্ডার কাকে বলা হয়?

(খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা শব্দভাণ্ডারকে কয়টি বিভাগে বিভক্ত করেছেন?

(গ) সুকুমার সেন বাংলা শব্দভাণ্ডারকে কয়টি বিভাগে বিভক্ত করেছেন?

(ঘ) মৌলিক শব্দের শ্রেণি বিভাগ কয়টি ও কী কী?

(ঙ) আগন্তুক শব্দের শ্রেণি বিভাগ কয়টি ও কী কী?

(চ) ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় আগত শব্দাবলিকে কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়?

(ছ) বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগের শব্দাবলির দুটি করে উদাহরণ দাও। (প্রতিটি ২ নম্বরের)

৩। উত্তর দাও : (মূল্যাঙ্ক : ৪/৫) :

(ক) শব্দভাণ্ডারের অধ্যয়নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

(খ) বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

(গ) ‘মৌলিক শব্দ’ কাকে বলে? এই বিভাগের বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

(ঘ) ‘আগন্তুক শব্দ’ কাকে বলে? এই বিভাগের বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

(ঙ) টীকা লেখো :

(i) তৎসম শব্দ (ii) অর্ধ-তৎসম শব্দ (iii) তদ্ভব শব্দ (iv) দেশি শব্দ (v) বিদেশি শব্দ (vi) অনুবাদ ঋণ (vii) ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত শব্দাবলি।

অশুদ্ধি সংশোধন

ব্যাকরণ ভাষার শুদ্ধ রূপটিকে চিহ্নিত করে। কিন্তু একথাও একান্ত সত্য যে, আপামর জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োগের মুখের ভাষাকে কোনোদিনই সর্বাঙ্গীনভাবে ব্যাকরণের বাঁধনে বাঁধা যায় না। ভাষা প্রবাহিতা নদীর মতো গতিশীল, চলমান। ভাষার এই চলার পথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল উচ্চারণ, অশুদ্ধ প্রয়োগ সন্নিবিষ্ট হয়। পরবর্তীকালে ব্যাকরণ এইসব ভুল উচ্চারণ, ভুল বানান এবং নানা ধরনের অশুদ্ধ প্রয়োগকে চিহ্নিত করে, ভুল সংশোধনের প্রয়াস করে। ব্যাকরণের এই প্রয়াসকে বলা হয় 'অশুদ্ধি সংশোধন।' এই অশুদ্ধি সংশোধনকে সাধারণ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। এই বিভাগগুলো হল— (১) বর্ণাশুদ্ধি (২) যুক্তাক্ষর ঘটিত অশুদ্ধি (৩) উচ্চারণ-দোষ ঘটিত অশুদ্ধি (৪) একই শব্দের বিভিন্ন বর্ণ-বিন্যাস (৫) শব্দ প্রয়োগের অসাবধানতা (৬) সন্ধি-বিষয়ক অশুদ্ধি বিচার (৭) সমাস-বিষয়ক অশুদ্ধি বিচার (৮) কৃৎ-তদ্ধিতাদি ঘটিত অশুদ্ধি (৯) বিশেষ্য বিশেষণাদির অপপ্রয়োগ (১০) বিশেষ্যের বিশেষণবৎ প্রয়োগ (১১) বিশেষণের বিশেষ্যবৎ প্রয়োগ (১২) বিভক্তি, লিঙ্গ, বচনাদি ঘটিত অশুদ্ধি (১৩) পদ্যে ব্যবহার্য শব্দের গদ্যে ব্যবহার এবং (১৪) ব্যাকরণদুষ্ট, কিন্তু বাংলার বহু প্রচলিত। এই বিভাগগুলোর প্রধান কয়েকটির পরিচয়—

১। বর্ণাশুদ্ধি : বাংলাভাষার স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের অশুদ্ধ প্রয়োগের ফলে যে ধরনের অশুদ্ধি সংঘটিত হয়, তাকে বর্ণাশুদ্ধি বলা হয়। সাধারণত বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ই, ঈ, উ, ঊ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের শ, ষ, স, জ, য, র, ড়, ঢ় সহ ব-ফলা, ও য-ফলা ইত্যাদির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। তাই এসব ক্ষেত্রে বর্ণাশুদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা থেকে যায়। এই বর্ণাশুদ্ধি বিষয়ে সচেতন হলে উচ্চারণ-সৌকর্য এবং বানান নির্ভুল হয়। এই বিভাগটিকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। এই উপবিভাগগুলোর পরিচয় নিম্নরূপ—

১.১. ই-ঈ-ঘটিত অশুদ্ধি : বাংলায় 'ই' এর 'ঈ'র উচ্চারণে সাধারণত কোনো বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। তাই বর্ণাশুদ্ধির সম্ভাবনা এক্ষেত্রে বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। এই উপবিভাগের কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধির উদাহরণ।

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
ইষৎ	ঈষৎ	নিশিথ	নিশীথ
বাল্মিকী	বাল্মীকি	পিপিলিকা	পিপীলিকা
শারিরিক	শারীরিক	কৃষিজীবি	কৃষিজীবী

১.২. উ-ঊ ঘটিত অশুদ্ধি : উ-ঊ ঘটিত কয়েকটি অশুদ্ধির উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
মুহুর্ত	মুহূর্ত	প্রতিকুল	প্রতিকূল
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা	নুপূর	নূপুর
মুষিক	মূষিক	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
পূণ্য	পুণ্য	কৌতুহল	কৌতূহল

১.৩. ণ, ন- ঘটিত অশুদ্ধি : ণ-ন ঘটিত অশুদ্ধির উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
অনু	অণু	শূণ্য	শূন্য
কনিকা	কণিকা	মূর্ধণ্য	মূর্ধন্য
কণক	কনক	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
ধারন	ধারণ	মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ	রামায়ন	রামায়ণ

১.৪. শ-ষ-স ঘটিত অশুদ্ধি : শ-ষ-স ঘটিত অশুদ্ধির উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
পরিস্কার	পরিষ্কার	ভষ্ম	ভস্ম
পুরষ্কার	পুরস্কার	শষ্য	শস্য

মানষিক	মানসিক	শান্ত্বনা	সান্ত্বনা

২. যুক্তাক্ষর ঘটিত অশুদ্ধি : ব-ফলা, য-ফলা ঘটিত অশুদ্ধি এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই বিভাগের উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
পক্ক	পক্ক	জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
উজ্জল	উজ্জ্বল	বিদ্যান	বিদ্বান
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	লক্ষী	লক্ষ্মী
সাহার্য্য	সাহায্য	সামর্থ	সামর্থ্য
মর্ত	মর্ত্য	সন্ধা	সন্ধ্যা
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	ত্রহস্পর্শ	ত্র্যহস্পর্শ

৩. উচ্চারণ-দোষ ঘটিত অশুদ্ধি : উচ্চারণের জড়তা বা শিথিলতার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে অশুদ্ধির আগমন হয়। এধরনের কয়েকটি অশুদ্ধির উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
অভ্যস্থ	অভ্যস্ত	নেয্য	ন্যায্য
বেথিত	ব্যথিত	ব্যায়	ব্যয়
পিচাশ	পিশাচ	ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন
সন্মান	সম্মান	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মনমোহন	মনোমোহন	সন্মুখে	সম্মুখে
গর্ধভ	গর্দভ	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য

৩.১. বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে য-ফলার উচ্চারণজনিত অশুদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য উপবিভাগ। বাংলায় য-ফলা উচ্চারণ খুব স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট না-হওয়ার জন্য, এধরনের অশুদ্ধি সংঘটিত হয়। এর কয়েকটি উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
ব্যকরন	ব্যাকরণ	ব্যখ্যা	ব্যাখ্যা

ব্যাবধান	ব্যবধান	ব্যধি	ব্যাধি
ব্যঘ্র	ব্যাঘ্র	ব্যয়াম	ব্যায়াম
ব্যাস্ত	ব্যস্ত	ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত

৪. **একই শব্দের বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস :** সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি শব্দে দ্বিবিধ বানান প্রচলিত। এই দ্বিবিধ বর্ণবিন্যাস থেকেও অশুদ্ধি সংঘটিত হওয়ার সুযোগ থাকে। এ ধরনের কয়েকটি দ্বিবিধ বর্ণ-বিন্যাসের উদাহরণ—

অঙ্কুর	অঙ্কূর	মকুট	মুকুট	ঊষা	উষা
মরীচ	মরিচ	কবাট	কপাট	কলসী	কলসি
কৃমি	ক্রিমি	কৈকেয়ী	কেকয়ী	ভূমি	ভূমী
ঋষ্টি	রিষ্টি	মসুর	মসূর	কটি	কটী
পদবী	পদবি	শ্রেণী	শ্রেণি	রজনী	রজনি
বসিষ্ঠ	বশিষ্ঠ	নিমিষ	নিমেষ	ধরণী	ধরণি
সূর্পণখা	শূর্পণখা	প্রতিকার	প্রতীকার	কুটীর	কুটির

বর্তমান কালে 'ই' ও 'ঈ'-কার যুক্ত এধরনের বানানের ক্ষেত্রে 'ঈ'-কার বর্জন করে 'ই'-কারকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. **শব্দ প্রয়োগের অসাবধানতা :** অনেক ক্ষেত্রে শব্দপ্রয়োগের অসাবধানতার জন্যও ভাষা প্রয়োগে অশুদ্ধতা সংঘটিত হয়। যেমন—

{ আর্ত — পীড়িত
  আত্ত — গৃহীত

{ পরে — পরিধান করে
  পড়ে — পতিত হয়, পাঠ করে

{ জন্মে — উৎপন্ন হয়
  জন্মায় — উৎপন্ন করে

{ পারক — সমর্থ
  পারগ — পারদর্শী

{ প্রকৃত — যথার্থ
  প্রাকৃত — স্বাভাবিক, নিকৃষ্ট

{ আপ্ত — বিশ্বস্ত, অভ্রান্ত
  আত্ম — আপন

৬. **সন্ধি-বিষয়ক অশুদ্ধি বিচার :** সন্ধি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকার ফলে এধরনের অশুদ্ধি সংঘটিত হয়। এই বিভাগটিও কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত। যেমন—

৬.১. অ-কারের পরবর্তী বিসর্গের পরিবর্তন : এই উপবিভাগের উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
মনযোগ	মনোযোগ	যশলাভ	যশোলাভ
অধগতি	অধোগতি	শিরমনি	শিরোমণি
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	মনচোর	মনশ্চোর

৬.২. বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
বাক্দান	বাগ্দান	তির্যকভাবে	তির্যগভাবে
ভবিষ্যৎবাণী	ভবিষ্যদ্বাণী	ঋক্বেদ	ঋগ্বেদ
বণিক্গণ	বণিগগণ	বাক্দেবী	বাগ্দেবী

৬.৩. বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ স্থানে প্রথম বর্ণ :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
হৃদ্পিণ্ড	হৃৎপিণ্ড	ক্ষুধ্পিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা
পশ্চাদ্পদ	পশ্চাৎপদ	সুহৃদ্সভা	সুহৃৎসভা

৬.৪. বিসর্গ স্থানে শ, ষ, স :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
আবিস্কার	আবিষ্কার	নিস্ফল	নিষ্ফল
পুরষ্কার	পুরস্কার	মনষ্কাম	মনস্কাম
তিরষ্কার	তিরস্কার	নমষ্কার	নমস্কার

৬.৫. ম-স্থানে অনুস্বার বা পঞ্চম বর্ণ :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
বারম্বার	বারংবার	স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর

সম্বরণ	সংবরণ	কিম্বদন্তী/কিম্বদন্তি	কিংবদন্তি
কিম্বা	কিংবা		

৬.৬. সন্ধি-বিষয়ক অন্যান্য অশুদ্ধি :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
অত্যাধিক	অত্যধিক	অনাটন	অনটন
যদ্যাপি	যদ্যপি	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	জ্যাত্যাভিমান	জ্যাত্যভিমান
নিরোগ	নীরোগ	সন্মত	সম্মত
দিগেন্দ্র	দিগিন্দ্র	জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী	তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
মুখছবি	মুখচ্ছবি	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত/ উপরিউক্ত

৭. সমাস-বিষয়ক অশুদ্ধি বিচার : এই বিভাগটি আবার কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত যেমন—

৭.১. সমাসে পূর্বপদের পরিবর্তন :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
কর্তাকারক	কর্তৃকারক	ভ্রাতাগন	ভ্রাতৃগণ
গুণীগন	গুনিগন	পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক
শশীভূষণ	শশিভূষণ	প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা
স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে	রাজাগণ	রাজগণ
সলজ্জিত	সলজ্জ	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ

৭.২. পরপদের পরিবর্তন :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
মহারাজা	মহারাজ	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
অহর্নিশি	অহর্নিশ	দিবারাত্র	দিবারাত্রি

নির্ধনী	নির্ধন	নিরপরাধী	নিরপরাধ
নিরোগী	নীরোগ	নির্দোষী	নির্দোষ

৭.৩. সমাস-ঘটিত অন্যান্য অশুদ্ধি :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে	আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত
ভগবান্ প্রদত্ত	ভগবৎ প্রদত্ত	পিতৃসখা	পিতৃসখ

৭.৪. কৃৎ-তদ্ধিতাদি ঘটিত অশুদ্ধি : এই বিভাগটিতে প্রত্যয়জনিত অশুদ্ধির আলোচনা করা হয়। এই ধরনের অশুদ্ধির উদাহরণ—

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
উদ্বেলিত	উদ্বেল	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
উচিৎ	উচিত	একত্রিত	একত্র
তথাপিও	তথাপি	স্বাতন্দ্র	স্বাতন্ত্র্য
ব্যবসা	ব্যবসায়	সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	সিঞ্চন	সেচন
সাধ্যাতীত	অসাধ্য	নিঃশেষিত	নিঃশেষ
বাহ্যিক	বাহ্য	ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
সত্ত্বা	সত্তা	স্বত্ত	স্বত্ব

৭.৫. বিশেষ্য-বিশেষণাদির অপপ্রয়োগ :

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
সকলেই মৌন হয়ে থাকলেন	সকলেই মৌনী হয়ে থাকলেন	এই বইয়ের আর কোনো আবশ্যক নেই	আবশ্যকতা নেই।
দেবী অন্তর্ধান হলেন	দেবী অন্তর্হিত হলেন	অপমান হওয়ার আর ভয় নেই	অপমানিত হওয়ার

৭.৬. বিশেষ্যের বিশেষণবৎ প্রয়োগ :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একথা আমার মনে উদয় হল	উদিত হল
গোপন কথাটা বলো	গোপনীয়

৭.৭. ব্যাকরণদুষ্ট, কিন্তু বাংলার বহুপ্রচলিত :

শুদ্ধ	বাংলায় প্রচলিত	শুদ্ধ	বাংলায় প্রচলিত
অর্ধাঙ্গ	অর্ধাঙ্গিনী	ইতঃপূর্বে	ইতিপূর্বে
নৈরাশ্য	নিরাশা	ইতোমধ্যে	ইতিমধ্যে
বহুরূপ	বহুরূপী	শরচ্চন্দ্র	শরৎচন্দ্র
শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতর, -তম	চাকচক্য	চাকচিক্য
কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠতর, -তম	সেবকা	সেবিকা

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (মূল্যাঙ্ক : ১) :

(ক) বাংলা ভাষার অশুদ্ধি সংশোধন ও অশুদ্ধি বিচার কয়টি বিভাগে বিভক্ত?

(খ) ‘বর্ণাশুদ্ধি’ বিভাগের যে কোনো একটি উপবিভাগের নাম বলো।

(গ) শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করো : ব্যকরণ, ব্যাকরণ/শিরচ্ছেদ, শিরশ্ছেদ।

(ঘ) মুহূর্ত-মুহুর্ত : কোন ধরনের বর্ণাশুদ্ধির উদাহরণ?

(ঙ) যুক্তাক্ষর ঘটিত অশুদ্ধির যে কোনো একটি উদাহরণ দাও।

(চ) ‘উজ্জল’-এর শুদ্ধ রূপটি নির্ণয় করো।

(ছ) কৃৎ-তদ্ধিতাদি ঘটিত অশুদ্ধির যে কোনো একটি উদাহরণ দাও।

(জ) ‘শরৎচন্দ্র’ শব্দটি বাংলার বহুল প্রচলিত হলেও শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট। এর শুদ্ধ রূপটি কী?

(ঝ) 'চাকচক্য' বাংলায় প্রচলিত হলেও, এর শুদ্ধ রূপটি কী?

(ঞ) 'ইতোমধ্যে' শব্দটি শুদ্ধ, কিন্তু তার পরিবর্তে বাংলায় কী ব্যবহৃত হয়?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (মূল্যাঙ্ক : ২) :**

(ক) একই 'অহ্ন' শব্দ যোগে গঠিত 'মধ্য + অহ্ন' এবং 'পূর্ব + অহ্ন' শব্দ দুটির শুদ্ধ রূপ নির্ণয় করো।

(খ) সন্ধি-বিষয়ক অশুদ্ধির যে কোনো দুটি উদাহরণ দাও :

(গ) 'সমাস-বিষয়ক অশুদ্ধি-বিচার' বিভাগের উপবিভাগ দুটির নাম উল্লেখ করো।

(ঘ) অশুদ্ধি সংশোধন করো—
কনিষ্ঠতম, ভৌগলিক, শারিরিক, উর্দ্ধ, রসায়ণ।

৩। **উত্তর দাও (মূল্যাঙ্ক : ৪/৫) :**

(ক) উদাহরণ ও বর্ণাশুদ্ধির বিভিন্ন উপবিভাগের বৈশিষ্ট্যসহ পরিচয় দাও।

(খ) 'সন্ধি বিষয়ক অশুদ্ধি বিচার' বিভাগের উপবিভাগগুলোর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করো।

(গ) টীকা লেখো :
সমাস-বিষয়ক অশুদ্ধি বিচার; 'ব্যাকরণদুষ্ট, কিন্তু বাংলায় বহু প্রচলিত' অশুদ্ধি প্রয়োগ; উচ্চারণ দোষ-ঘটিত অশুদ্ধি।

কারক-বিভক্তি

১. **কারক** : বাক্যের সাহায্যে আমরা মনের ভাব প্রকশ করি। বাক্য গড়ে ওঠে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের সমাহারে। বাক্যের এই উপাদান অর্থাৎ পদগুলোকে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া নামে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনামকে বলা হয় 'নামপদ' এবং ক্রিয়া-প্রকাশক পদকে বলা হয় 'ক্রিয়াপদ'। এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য নামপদের সম্বন্ধের নামই হ'ল 'কারক'। ক্রিয়াপদকে কে, কী, কিসের দ্বারা, কাকে, কোথা থেকে, কোথায় ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করলে এই সম্বন্ধগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন— 'মামাবাড়িতে বড়োমামা নিজহাতে আলমারি থেকে ভাগনে-ভাগনিদের জামা-কাপড় দিলেন' বাক্যটির ক্রিয়াপদ 'দিলেন'-কে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো করলে নিম্নলিখিত সম্বন্ধগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কে দিলেন? — বড়োমামা (কর্তৃসম্বন্ধ)

কী দিলেন? — জামা-কাপড় (কর্ম সম্বন্ধ)

কীসের দ্বারা/কেমন করে দিলেন? — নিজ হাতে (করণ সম্বন্ধ)

কাকে দিলেন? — ভাগনে-ভাগনিদের (কে) (সম্প্রদান সম্বন্ধ)

কোথা থেকে দিলেন? — আলমারি থেকে (অপাদান সম্বন্ধ)

কোথায় দিলেন? — মামাবাড়িতে (অধিকরণ সম্বন্ধ)

এখন দেখা গেল, 'বড়োমামা', 'জামা-কাপড়', 'নিজহাতে', 'ভাগনে-ভাগনিদের', 'আলমারি থেকে', 'মামাবাড়িতে' পদগুলোর সঙ্গে ক্রিয়াপদ 'দিলেন'-এর সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধগুলোই হ'ল 'কারক'। ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধ-অনুসারে কারক হল ছয়টি— কর্তৃ (কর্তা), কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। আমরা এই পাঠে প্রথমে কারক সম্বন্ধে আলোচনা করে কারকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিয়ে তারপর বিভক্তি বা কারক-বিভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১.১. কর্তৃকারক : বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়ার 'কর্তা'কে সূচিত করে, অর্থাৎ যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মাধ্যমে 'ক্রিয়া' সম্পাদিত হয়, তাকে কর্তৃকারক বলা হয়। যেমন— 'সুনয়না এখন বাংলা পড়ছে' বাক্যে ক্রিয়াপদ 'পড়ছে' সম্পাদিত হয়েছে 'সুনয়না'-র মাধ্যমে। এই 'সুনয়না' পদটিকে আশ্রয় করেই 'পড়ছে' ক্রিয়াপদটি অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং বাক্যটিতে 'সুনয়না' পদটি কর্তৃসম্বন্ধ লাভ করেছে। ক্রিয়াপদের সঙ্গে এই কর্তৃসম্বন্ধকে বলা হয় কর্তৃকারক। আরো কয়েকটি উদাহরণ—

১.১. (ক) কাজল খেলে। — কাজল (কর্তৃকারক)

(খ) বিকাশবাবু বাজার করছেন। বিকাশবাবু (কর্তৃকারক)

(গ) আমার যেতে হবে। আমার (কর্তৃকারক)

(ঘ) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। চোর (কর্তৃকারক)

১.২. কর্মকারক : যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে 'কর্ম' বলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে ক্রিয়ার বিষয়কে বলা হয় 'কর্ম'। এই 'কর্ম' অর্থাৎ ক্রিয়ার বিষয়কে বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মাধ্যমে বোঝানো হয়, তাকে 'কর্মকারক' বলা হয়। যেমন— (i) 'সুমিত্রা রবীন্দ্রসংগীত শুনছে' বাক্যে 'শুনছে' ক্রিয়াপদের বিষয় হল 'রবীন্দ্র সংগীত'। সুতরাং বাক্যটিতে 'রবীন্দ্রসংগীত' পদটি হল 'কর্মকারক'। (ii) বাবা ছেলেকে বলছেন বাক্যে 'বলছেন' ক্রিয়াপদের বলার বিষয় হল 'ছেলে' অর্থাৎ বাক্যটির কর্তা 'বাবা'র ক্রিয়ার বিষয় হল— 'ছেলে'। সুতরাং বাক্যটিতে 'ছেলেকে' পদটি হল 'কর্মকারক'— 'বলছেন' ক্রিয়াপদটির 'কর্ম'।

উপরিউক্ত বাক্য দুটি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রথম বাক্যে কর্মকারকটি 'অপ্রাণীবাচক', কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে তা 'প্রাণীবাচক'। কোনো কোনো ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আবার দুটি কর্মও থাকতে পারে। এর মধ্যে যে 'কর্ম'টি ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রধানভাবে সম্পর্কিত, তাকে 'মুখ্যকর্ম' বলা হয়, এবং ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে 'কর্ম' পদটির সম্পর্ক বা সম্বন্ধ অপ্রধান, তাকে 'গৌণকর্ম' বলা হয়। সাধারণত অপ্রাণীবাচক কর্ম হয় 'মুখ্যকর্ম' এবং প্রাণীবাচক কর্ম হয় 'গৌণকর্ম'।

একই বাক্যে মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্মের কয়েকটি উদাহরণ—

১.২. (ক) 'সুমিত্রা মালবিকাকে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে বলছে' বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ হল 'বলছে', এবং কর্তৃকারক হল 'সুমিত্রা'। এতে কর্তার 'বলা' বা ক্রিয়ার বিষয় হচ্ছে 'মালবিকা' এবং 'রবীন্দ্র সংগীত'। এর মধ্যে মুখ্য কর্ম হল 'রবীন্দ্র সংগীত' (অপ্রাণীবাচক) এবং গৌণকর্ম হ'ল 'মালবিকা' (প্রাণীবাচক)।

(খ) বাবা ছেলেকে ইতিহাস পড়তে বলছেন — 'বাবা' (গৌণকর্ম) এবং 'ইতিহাস' (মুখ্যকর্ম)

(গ) অন্ধজনে দেহ আলো— অন্ধজন (গৌণকর্ম) এবং আলো (মুখ্যকর্ম)

(ঘ) তাকে সব কথা খুলে বলো — তাকে (গৌণকর্ম) এবং কথা (মুখ্যকর্ম)

(ঙ) বিমল অমলকে একটা বই পড়তে দিয়েছে— অমলকে (গৌণকর্ম) এবং বই (মুখ্যকর্ম)

১.৩. করণ কারক : কর্তা যার মাধ্যমে বা যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে 'করণ' বলা হয়। বাক্যে যে নামপদ এই 'করণ'কে সূচিত করে, তাকে 'করণ কারক' বলা হয়। যেমন— 'অনিন্দিতা ভালো কলম দিয়ে লেখে' বাক্যে কর্তা 'কলম দিয়ে' ক্রিয়া 'লেখা' সম্পাদন করছে। এক্ষেত্রে 'কলম দিয়ে' হল করণ কারক। এই বাক্যটিকেই অন্যরকমভাবে বলা যায়— 'অনিন্দিতা ভালো কলমে লেখে'। এক্ষেত্রে করণ কারক হবে 'কলমে'। এধরনের আরো কয়েকটি উদাহরণ—

১.৩. (ক) গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা— গঙ্গাজলে (করণ কারক)

(খ) চালাকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ করা যায় না— চালাকি দিয়ে (করণ কারক)

(গ) সময়ে সবই হবে— সময়ে (করণ কারক)

(ঘ) শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়— গোঁফে (করণ কারক)

(ঙ) সে বিদ্যায় বৃহস্পতি— বিদ্যায় (করণ কারক)

১.৪. সম্প্রদান কারক : স্বত্ব ত্যাগ করে কোনো কিছু দান করাকে বলা হয় 'সম্প্রদান'। বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে এই ধরনের দান করার পাত্রকে সূচিত করা হয়, তাকে 'সম্প্রদান কারক' বলা হয়। অন্যভাবে

বলতে গেলে, বাক্যমধ্যে স্বত্বত্যাগ করে যাকে কোনো বস্তু দান করা হয়, তাকেই 'সম্প্রদান কারক' বলা হয়। যেমন— 'ভিখারিকে ধন দাও' বাক্যে স্বত্ব ত্যাগ করে 'ভিখারিকে' ধন দান করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে 'ভিখারিকে' পদটি 'সম্প্রদান কারক' হয়ে উঠেছে। এধরনের আরো কয়েকটি উদাহরণ—

১.৪. (ক) বিনয়বাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ছোটো মেয়েকে দান করলেন। —'ছোটো মেয়েকে' (সম্প্রদান কারক)

(খ) ক্ষুধার্তকে খাবার দাও — 'ক্ষুধার্তকে' (সম্প্রদান কারক)

(গ) যোগ্যবরে কন্যা সম্প্রদান করো— (যোগ্য) বরে (সম্প্রদান কারক)

(ঘ) ছেলে-মেয়েদের পুজোর কাপড় কিনে দিলাম— ছেলে-মেয়েদের (সম্প্রদান কারক)

(ঙ) 'পিতা, আমায় বিদ্যা দাও" (—অবনীন্দ্রনাথ) — আমায় (সম্প্রদান কারক)

১.৫. অপাদান কারক : যা থেকে কোনো কিছু হওয়া, করা, ভয় পাওয়া ইত্যাদি সূচিত হয়, তাকে 'অপাদান' বলা হয়। বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে এধরনের 'অপাদান'কে সূচিত করা হয়, তাকে 'অপাদান কারক' বলা হয়। যেমন— 'সঞ্জয় নিউইয়র্ক থেকে গুয়াহাটিতে এসেছে' বাক্যটিতে 'নিউইয়র্ক থেকে' 'অপাদান' সূচিত করেছে। সুতরাং 'নিউইয়র্ক থেকে' হয়েছে 'অপাদান কারক'। এধরনের আরো কয়েকটি উদাহরণ—

১.৫. (ক) তিলে তেল হয় — 'তিলে' (অপাদান কারক)

(খ) বিপুল বড়ো বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে— বিপদ থেকে (অপাদান কারক)

(গ) ছোটোবেলা থেকেই ব্যায়াম করা দরকার— ছোটোবেলা থেকেই (অপাদান কারক)

(ঘ) গুয়াহাটি থেকে শিলং বেশি দূর নয়— গুয়াহাটি থেকে (অপাদান কারক)

(ঙ) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও বড়ো— 'স্বর্গ থেকেও' (অপাদান কারক)

১.৬. অধিকরণ কারক : ক্রিয়ার আধারকে বলা হয় 'অধিকরণ'। বাক্যে এই 'অধিকরণ' যে পদে বোঝানো হয়, তাকে 'অধিকরণ কারক' বলা হয়। সাধারণ ক্রিয়ার 'আধার' বলতে 'দেশ' (স্থান, পাত্র), 'কাল' ও 'বিষয়'কে বোঝানো হয়। ক্রিয়াপদকে 'কোথায়', 'কখন', কোন বিষয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলে, যে উত্তর পাওয়া যায়, বাক্যে তাই অধিকরণ কারককে সূচিত করে। যেমন— 'করুণা রোজ সকালে স্টেডিয়ামে ব্যাডমিন্টন খেলে, ব্যাডমিন্টনে সে ক্রমশ পারদর্শী হয়ে উঠছে' বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ হল 'খেলে', এই ক্রিয়াপদকে 'কোথায়' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে— 'স্টেডিয়ামে' 'কখন' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে— (রোজ) সকালে এবং 'কোন বিষয়ে' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে— 'ব্যাডমিন্টনে' এখানে। 'স্টেডিয়ামে' স্থান-নির্দেশক, (রোজ) 'সকালে' কাল-নির্দেশক এবং 'ব্যাডমিন্টনে' বিষয়-নির্দেশক অধিকরণ কারক।

অধিকরণ কারকের আরো কয়েকটি উদাহরণ—

১.৬. (ক) ফলে না সকল বৃক্ষে সুমধুর ফল।
সকল সরসী জলে ফুটে না কমল। — কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
— 'বৃক্ষে' এবং 'জলে' অধিকরণ কারক।

(খ) 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ'
— 'সিদ্ধিতে' (অধিকরণ কারক)

(গ) তিলে তেল থাকে। — তিলে (অধিকরণ কারক)

(ঘ) চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার দূর হল। — 'চন্দ্রোদয়ে' (অধিকরণ কারক)

(ঙ) এ যুদ্ধে বাধা দিও না (—দ্বিজেন্দ্রলাল)— যুদ্ধে (অধিকরণ কারক)

১.৭. সম্বন্ধ পদ : ক্রিয়ার সঙ্গে 'কারক'-সম্পর্ক সূত্রে সরাসরি সম্পর্কিত না-হয়েও, কোনো কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ, অন্যান্য বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। এধরনের পদকে বলা হয় 'সম্বন্ধ পদ'। যেমন—

'রমেনকে একটা উপন্যাস দাও' বাক্যে ক্রিয়াপদ 'দাও', কর্তৃকারক হ'ল 'তুমি' (উহ্য) এবং কর্মকারক— রমেনকে (গৌণকর্ম) ও উপন্যাস (মুখ্য কর্ম)। কিন্তু 'রমেনকে একটা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস দাও' বাক্যে 'শরৎচন্দ্রের' পদটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তবে বাক্যেরই অন্য একটি নামপদ 'উপন্যাস'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। বাক্যে এধরনের পদকেই বলা হয় 'সম্বন্ধ পদ'।

এধরনের সম্বন্ধ পদের আরো কয়েকটি উদাহরণ—

১.৭. (ক) সুবোধদের আমগাছে অনেক ফল ফলেছে। — সুবোধদের আমগাছ (সম্বন্ধপদ)

(খ) অমিতের দাদা বড়ো গায়ক। —অমিতের দাদা (সম্বন্ধপদ)

(গ) সূর্যের তাপ বেড়েই চলেছে। —সূর্যের তাপ (সম্বন্ধপদ)

(ঘ) চোখের জল আর বাধা মানেনি। — চোখের জল।

(ঙ) দুস্থকে সাহায্য করা মানুষের কর্তব্য। — মানুষের কর্তব্য।

২. কারক-বিভক্তি : বাক্যে কারকের অর্থ অর্থাৎ ক্রিয়াপদের মধ্যে অন্যান্য নামপদের সম্বন্ধকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে কতগুলো বিভিক্তি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে কারক-বিভক্তি বলা হয়। আমরা জানি নে, বাক্যে প্রযুক্ত হওয়ার সময় শব্দ ও ধাতুর পরে কয়েকটি বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিযুক্ত হয়, এবং সেই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় 'বিভক্তি'। বিভক্তি দুই প্রকারের— শব্দ-বিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি। এর মধ্যে 'শব্দের' সঙ্গে এ, র, কে ইত্যাদি বিভক্তি এবং ধাতুর সঙ্গে, এ, ই, ছে, ছেন, বে, বেন, ছিল, তাম, লাম ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত হয়। এই বিভক্তিচিহ্নগুলোর কোনো আলাদা প্রয়োগ হয় না, এগুলোর আলাদাভাবে নিজস্ব কোনো অর্থও নেই। বাক্যমধ্যে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এগুলো পদের অর্থকে বা কারককে সুনিশ্চিত করে।

বাংলাভাষায় কারকে যে শব্দবিভক্তিগুলো যুক্ত হয়, সেগুলো হল—

কর্তৃকারক — অ (অথবা শূন্য বিভক্তি), এ, (য়ে, য়), তে (এতে)

কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকে } এ (য়ে, য়), কে, রে (এরে)

করণ কারকে ও অধিকরণ কারকে } এ (য়ে, য়) তে (এতে)

এখানে লক্ষণীয় যে বাংলায় অপাদান কারকে কোনো বিভক্তি কোনো বিভক্তি চিহ্নযুক্ত হয়নি। এই কারকে বিভক্তির পরিবর্তে কয়েকটি অব্যয় ইত্যাদি শব্দ বা অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়। অপাদান কারক ছাড়াও অন্যান্য কারকেও এই ধরনের অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। এধরনের অনুসর্গগুলোকে কারক বাচক অনুসর্গ বলা হয়। বাংলার কারক-বাচক অনুসর্গগুলো—

করণ কারকে — দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, করে

সম্প্রদানে — জন্য, তরে, লাগিয়া (সাধু ভাষায়), নিমিত্ত, কারণ, হেতু।

অপাদানে — হইতে (হতে), থেকে, কাছ থেকে, নিকট হইতে (সাধু)

অধিকরণে — কাছে, মধ্যে, ভিতর, নিকটে।

এই কারকবাচক অনুসর্গগুলোর স্বতন্ত্র প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, এবং এগুলোর নিজস্ব অর্থও আছে। এগুলো অবিকৃতভাবে অথবা বিভক্তিযুক্তভাবে বিশেষ্যের পরে প্রযুক্ত হয়।

বিভিন্ন কারক বোঝাতে শব্দের পর ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ হয়। বাংলার এই কারক-বিভক্তির এক সাধারণ পরিচয় লক্ষ করা যাক—

২.১ কর্তৃকারক :

২.১.১. কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি : কর্তৃকারকে সাধারণত শূন্য বিভক্তি হয়। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে প্রথমা বিভক্তির এ, য় (য়ে), তে, এতে (এরে) বিভক্তিগুলোও ব্যবহৃত হয়।

২.১.১. (ক) কর্তৃকারকে শূন্য (০) বিভক্তি : (i) **বনলতা** বই পড়ে।

(ii) নিবেদিল **রাজভৃত্য**

(—রবীন্দ্রনাথ)

(iii) **পাখি** সব করে রব রাতি পোহাইল।

(খ) কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি :
(i) পাগলে কি না বলে, **ছাগলে** কি না খায়।
(ii) **রতনে** রতন চেনে।
(iii) **দশে** মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
(iv) নবকুমারকে **ব্যাঘ্রে** হত্যা করিয়াছে (—বঙ্কিমচন্দ্র)

(গ) কর্তৃকারকে 'তে' বিভক্তি :
(i) **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে।
(ii) **গোরুতে** লাঙ্গল টানে।
(iii) **বাপ-বেটাতে** চাষ করে।

(ঘ) কর্তৃকারকে 'য়' বিভক্তি :
(i) **ঘোড়ায়** গাড়ি টানে।
(ii) **ধোপায়** কাপড় কাচে।
(iii) **রাজায়-রাজায়** যুদ্ধ হয়।
কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'য়ে' বিভক্তিও পাওয়া যায়। যেমন—
(iv) **মায়ে-ঝিয়ে** কাজ করে।
(v) **ছেলে-বুড়োয়** মেতে রয়েছে।

২.১.২. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি : কর্তৃকারকে সাধারণত প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হলেও, ক্ষেত্রবিশেষে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্য কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তিত যুক্ত হয়। যেমন—

(i) কর্মবাচ্যে— **তোমাকে** এ কাজ করতেই হবে।
(ii) ভাববাচ্যে— **আমাকে** এবার উঠতে হবে।
(iii) অকর্মক ক্রিয়ার কর্তায়— **লোকটিকে** একদম মনে পড়ছে না। **তাকে** মনে পড়ছে না।

২.১.৩. কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তিও যুক্ত হয়। কর্মবাচ্যের কর্তা বা অনুক্ত কর্তার ক্ষেত্রে এধরনের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

(i) তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না। (ii) তার দ্বারাই এ বইটা রচিত হয়েছে।

২.১.৪. কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি : কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে কখনো কখনো কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—

কর্মবাচ্যে : (i) **আমার** বই পড়া শেষ হয়েছে।

(ii) গৃহদাহ **শরৎচন্দ্রের** রচিত।

ভাববাচ্যে : (iii) এবার **আমার** তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে।

২.১.৫. কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি : কোনো কর্তার অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকলে, সেখানে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন—

(i) '**জ্ঞানে** মৌনী, ত্যাগে তিনি শ্লাঘারহিত।'

(ii) '**স্মৃতিভ্রংশে** বুদ্ধিনাশ, **বুদ্ধিনাশে** নষ্ট নরাধম।'

২.২. কর্মকারক :

২.২.১ কর্মকারকে সাধারণত দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। যেমন—

(i) '-কে' বিভক্তি : **ডাক্তারকে** ডাকো। তোমার **মেয়েকে** খবর দাও।

(ii) '-রে' বিভক্তি : **তারে** (তাকে) একবার খাওয়াও না।

দোকানিরে কইলাম, (উপভাষায়)

'কে **তোরে** সাজাল দিয়ে পত্রপুষ্পফল' (পদে)

(iii) লুপ্ত বিভক্তি (শূন্যবিভক্তি) : কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি চিহ্ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—

ডাক্তার ডাকো। **ভগবান** দেখেছ?

রাখাল **গোরু** চরায়। **বুদ্ধি** খাটিয়ে কাজ করো।

২.২.২. কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি :

(ক) '-এ' বিভক্তি : 'বৃথা গঞ্জ **দশাননে**' (—মধুসূদন দত্ত)

কী **সাহসে** একথা বললে।

পুলিসে খবর দাও।

(খ) '-য়' বিভক্তি : **তোমায়** সব খুলে বলব।

নাহি মানে **পাতসায়** (বাদশাহকে) —ভারতচন্দ্র

২.৩. করণ কারক : বাংলার করণ কারকে সাধারণত দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক ইত্যাদি কারক-বাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভক্তি চিহ্নও যুক্ত হয়।

২.৩.১. করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি : খেলাধুলা বা মারামারির অর্থসূচক ক্রিয়ার করণে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয় এবং সেক্ষেত্রে শূন্য বিভক্তি হয়।

যেমন— (i) তিনজন মিলে **তাস** খেলছে। (অর্থাৎ তাস দিয়ে খেলছে)

(ii) ছেলেরা বল খেলছে।

(iii) লোকটাকে **বেত** মেরেছে। (অর্থাৎ বেত দিয়ে)

২.৩.২. করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি :

(ক) '-এ' বিভক্তি :

(i) **ছলে-বলে** কাজটা করতেই হবে।

(ii) **ভাতে** পেট ভরে।

(iii) তিনি **নিজ হাতে** কাজটা করেছেন।

(iv) আমরা **চোখে** দেখি, **কানে** শুনি।

(v) আমি **কলমে** লিখি, তুমি পেনসিলে লেখো।

(খ) '-য়' বিভক্তি : (i) **টাকায়** কী না হয়।

(ii) **নৌকায়** নদী পার হও।

(iii) **হেলায়** সুযোগ হারিও না।

(গ) '-তে' বিভক্তি : (i) **কড়িতে** বাঘের দুধ মেলে

(ii) **লাঠিতে** পেটাই

(iii) **দুঃখেতে** কাতর

(iv) **ছুরিতে** কাটো।

২.৩.৩. করণ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি :

(i) চোরকে **লাঠির বাড়ি** মারা হল।

(ii) এ **কমলের** লেখা সুন্দর।

(iii) কালির আঁচড়।

(iv) মড়ার উপর **খাঁড়ার** ঘা।

২.৪. সম্প্রদান কারক : সম্প্রদান কারকে সাধারণত চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়। এই বিভক্তির চিহ্ন ‘কে’, এবং ‘রে’। যেমন—

(ক) ‘কে’ বিভক্তি : (i) **ভিখারিকে** ভিক্ষা দাও।

(ii) **ক্ষুধার্তকে** খাদ্য দাও।

(খ) ‘-রে’ বিভক্তি : (i) যে **আমারে** গৃহ করে দান। (—রবীন্দ্রনাথ)

এছাড়াও সম্প্রদান কারকে অন্যান্য বিভক্তিও যুক্ত হয়। যেমন—

(গ) সম্প্রদান কারকে শূন্য বিভক্তি : (i) দিব **তোমা** ভক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(ঘ) ‘-এ’ বিভক্তি : (i) সর্ব কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে।

(ii) **অন্ধজনে** দেহ আলো, **মৃতজনে** দেহ প্রাণ।

(—রবীন্দ্রনাথ)

(iii) যোগ্য **বরে** কন্যাদান করো।

(ঙ) ‘-তে’ বিভক্তি : (i) **সমিতিতে** চাঁদ দিতে হবে।

(ii) সে **গঙ্গাতে** অস্থি বিসর্জন দিল।

(চ) ‘-য়’ বিভক্তি : (i) **আমায়** দে মা তবিলদারি। (—রামপ্রসাদ)

(ii) পিতা, **আমায়** বিদ্যা দাও। (—অবনীন্দ্রনাথ)

(ছ) ‘-র’ বিভক্তি : (i) **দেবতার** ধন/কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন্।’ (—রবীন্দ্রনাথ)

২.৫. অপাদান কারক : বাংলায় অপাদান কারকে সাধারণত থেকে, হতে (হইতে) ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই কারকে বিভক্তির প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। যেমন—

২.৫.১. অপাদান কারকে শূন্য (০) বিভক্তি :

(i) **বাড়ি** পালিয়ে কোথায় যাবে? (বাড়ি = বাড়ি থেকে)

(ii) ‘সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর **পাঠশালা** পলায়ন’ —রবীন্দ্রনাথ।

২.৫.২. অপাদান কারকে -কে -রে বিভক্তি :

(i) **জলকে** অনিলের বড়ো ভয়।

(ii) ‘ছোটো-ছোটো ছেলেরা **ভূতেরে** ডরায়।’

২.৫.৩. অপাদান কারকে ষষ্ঠীর -র, -এর বিভক্তি :

(i) যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। (বাঘের = বাঘ থেকে)

(ii) অনিরুদ্ধ **আমার** বয়সে বড়ো। (আমার = আমার থেকে)

২.৫.৪. অপাদান কারক ‘-এ’, ‘-তে’ বিভক্তি :

(i) **মেঘে** বৃষ্টি হয়। (মেঘে = মেঘ থেকে)

(ii) **অর্থে** অনর্থ ঘটে।

(iii) **বিপদে** মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা (—রবীন্দ্রনাথ)

(iv) **তিলে** তেল হয়।

(v) ‘সংসারে আসিয়া এই পরম **সুখে** বঞ্চিত হইলাম। (—বিদ্যাসাগর)

(vi) ‘এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসন করাই উচিত, নহিলে **‘ধর্মে’** পতিত হইতেছি। (—বঙ্কিমচন্দ্র)

(vii) **এতে** আলকাতরা জন্মায়।

২.৬. অধিকরণ কারক : অধিকরণ কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন—

(i) ‘-এ’ বিভক্তি : **জলে** কুমুদের বাস, চাঁদের **আকাশ।**

তিলে তেল আছে।

সমুদ্রজলে লবণ আছে।

বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে। (—বিভূতিভূষণ)

ব্যাগে বই আছে

এযুদ্ধে বাধা দিও না। (—দ্বিজেন্দ্রলাল)

জাহান্নামে গিয়ে ঢুকল। (—মুজতবা আলী)

বিকালে বেড়াতে যাব।

(ii) ‘-তে’ বিভক্তি :

ঝুড়িতে আনারস রেখেছি।

সকল **নিশিতে শশী** হয় না প্রকাশ। (—সদ্ভাব-শতক)

বাড়িতে কখন থাকবে?

গুয়াহাটিতে আমার মামার বাড়ি।

(iii) ‘-য়’ বিভক্তি :

গত সোমবার **কলকাতায়** ছিলাম।

আমি **বিদ্যায়** আপনার নিকট বালক এবং বয়সে কনিষ্ঠ। (—রাম-বনবাস)

২.৬.১. অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি ছাড়াও অন্যান্য বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন—

২.৬.১. (ক) অধিকরণ কারকে শূন্য (০) বিভক্তি :

(i) তোমার **বাড়ি** গিয়ে আমি দুদিন ফিরে এসেছি।

(ii) আমি আগামী **সোমবার দিল্লি** যাব। পরের **দিন** উৎসব।

২.৬.২. (খ) ‘-কে’ বিভক্তি :

(i) **ঘরকে** চল।

প্রশ্নাবলি

১। **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :** (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ১ নম্বর)

(ক) বাংলায় কারক কয়টি?

(খ) কর্তৃকারকের ‘-তে’ বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।

(গ) কর্মকারকের সপ্তমী বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।

(ঘ) করণ কারকের শূন্য বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।

(ঙ) সম্প্রদান কারকের ‘-তে’ বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।

(চ) অপাদান কারকের ষষ্ঠী বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।

(ছ) সম্বন্ধ পদের একটি উদাহরণ দাও।

(জ) অধিকরণ কারকের ‘-কে’ বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।

(ঝ) বাংলায় বিভক্তি কয়টি?

(ঞ) ‘শিকারি বেড়াল **গোঁফে** চেনা যায়।’ —নিম্নরেখ পদটি কোন কারক সূচিত করে।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :** (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ২/৩ নম্বর)

(ক) বাক্যের উপাদান কয়টি এবং কী কী?

(খ) ‘কারক’ বলতে কী বোঝ?

(গ) 'কারক' কয় প্রকার ও কী কী?

(ঘ) কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে কি? যদি পারে, তবে একটি উদাহরণ উল্লেখ করো, যদি না-পারে, তবে কেন, তা উল্লেখ করো।

(ঙ) করণ কারকে প্রথমা ও ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ দেখিয়ে একটি করে উদাহরণ দাও।

(চ) কর্ম কারকের দুটি প্রকারভেদের নাম কী?

(ছ) বাংলায় কোন কোন কারকে সাধারণ বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়?

(জ) করণ কারকে সাধারণত কোন কোন কারক বাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়?

(ঝ) অপাদান কারকে সাধারণত কোন কোন কারক বাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়?

(ঞ) বাংলায় অধিকরণ কারকে কোন কোন কারক বাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়?

(ট) নিম্নরেখ পদের কারক বিভক্তি কোন কারকে কোন বিভক্তি নির্ণয় করো :

(i) '**পাখি** সব করে রব রাতি পোহাইল'।

(ii) **তোমায়** সব খুলে বলব।

(iii) আমি **কলমে** লিখি, তুমি পেনসিলে লেখো।

(iv) '**অন্ধজনে** দেহ আলো, মৃতজনে প্রাণ।'

(v) 'যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।'

(vi) **তিলে** তেল হয়।

(vii) **তিলে** তেল আছে।

(vii) **তিলে** তেল আছে।

৩। **উত্তর দাও :** (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক : ৪/৫ নম্বর)

(ক) বাংলায় সাধারণত কোন কারকে কোন বিভক্তি প্রযুক্ত হয়, তা উদাহরণসহ আলোচনা করো।

(খ) বাংলায় সকল কারকেই যে '-এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হতে পারে, তা উদাহরণসহ আলোচনা করো।

(গ) বিভিন্ন কারকে '-র' বিভক্তির ব্যবহার উদাহরণসহ আলোচনা করো।

(ঘ) কর্ম, অপাদান এর অধিকরণ কারকে শূন্য (০) বিভক্তির প্রয়োগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

(ঙ) কোন কোন কারকে প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে, তা উদাহরণসহ আলোচনা করো।

(চ) শব্দবিভক্তি কাকে বলা হয়? এই বিভক্তিগুলো কোন অর্থ প্রকাশ করে? বাংলায় শব্দবিভক্তিগুলো উল্লেখ করো।

(ছ) উদাহরণসহ বিভক্তি ও অনুসর্গের পার্থক্য আলোচনা করো।